প্রতিফল।

প্রকৃত ঘটনা-মূলক উপন্যাস।)

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়
প্রণীত

ও

অনুসন্ধান-কার্য্যালয়,
৮নং টেমার্স লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা হইতে
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

কার্ত্তিক, ১৩০০ সাল।

CALCUTTA:

ed by UPENDRA NATH DATT, at the

RIPON PRESS:

প্রতিফল।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন দুইদিন করিয়া পাঁচ দিনের সন্ধ্যার সময়ে, প্রমথ-নাথের নৌকাখানি হরিষপুরের ঘাটে পঁহুছিল। নৌকা, প্রথমে কপিলা নদী, তার পর জলা নদী, সর্ব্বশেষে অমলা নদীর বুক বাহিয়া, হরিষপুরের মুখ দেখিতে পাইল।

হরিষপুরের ঘাটে নৌকা লাগিল, কিন্তু প্রমথনাথের মনে হরিষের তেমন উদ্রেক হইল না। না হইবার কারণ, একে বিদেশ-বিভূঁই, কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নাই, তাহাতে আবার দিবার শেষ—সন্ধ্যা। কোথায় একটি ভাল বাসা পাইবেন, সে সন্ধান এই অসময়ে হইবার কোন সুবিধা নাই। কিয়ৎক্ষণ নানারূপ চিন্তা করিয়াও কোনরূপ সদুপায় পাইলেন না, সুতরাং সেই রাত্রে নৌকাতেই অবস্থিতি করা উপযুক্ত ভাবিলেন।

তার পর সকলে কিছু কিছু জলযোগ করিয়া, নিদ্রাযোগ ভোগ করিতে লাগিলেন।

যথাকালে যামিনীকামিনী বিষাদিনী হইয়া, অঙ্গের কাল ওড়নাখানি খুলিয়া ফেলিল। পূর্ব্বদিকে উষাসুন্দরী ঘুমাইতেছিল, যামিনীর ওড়না ফেলিবার হাওয়া লাগিয়া, আচম্‌কা জাগিয়া উঠিল। নিমীলিত নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। সেই আধ-ঘুম-ঘোর চক্ষু ফুটিয়া কেমন একটি ছায়া-শোভা-মাখা বিভা ছুটিল। বিভাবরীর চক্ষে উষার সে নয়নবিভা আর সহিল না; বেগে বরাবর পশ্চিম দিকে ছুটিতে লাগিল। উষা যেন লজ্জিতা হইয়া, "কোথা যাও বোন্‌, কোথা যাও" বলিয়া রজনীকে ধরিতে ছুটিল। রজনী কিন্তু একটিবারও মুখটি ফিরাইয়া, উষার পানে তাকাইল না।

কোমলাঙ্গী উষাকে নিশার পশ্চাতে ছুটিতে দেখিয়া, সূর্য্যদেব কাতর হইলেন। যেন কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তাই রাঙ্গা চোখে, "আরে কি কর, কোথা যাও উষে, ও কেলে মাগীটার পশ্চাতে কেন ছুটিতেছ, ফিরিয়া আইস, দাঁড়াও, আর যেও না" বলিতে বলিতে, উষার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। পশ্চিমে নিশা, মধ্যে উষা, পূর্ব্বে পূষা, সাঁ সাঁ করিয়া চলিতেছে। তাই দেখিয়া, ভয়েই হউক, বা ভরসাতেই হউক, গাছের পাখী চিচিকুচি করিয়া সাড়া দিল। হরিষপুরের নরনারীরা বুঝিল, ভোর হইয়াছে, দোর খোলো।

প্রভাতে সূর্য্য উঠিলেন। সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাস্থ সকলে উঠিল। প্রমথনাথ, অক্ষয়কুমারকে লইয়া, একটি বাসা ঠিক করিবার জন্য, প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে প্রমথনাথের নৌকার নিকটে একখানি ছোট জেলে-ডিঙ্গি আসিয়া পঁহুছিল। সেই ডিঙ্গির উপর দুইটি লোক; একজনের নাম মধু, বয়স

আন্দাজ ৫০, দ্বিতীয়ের নাম মধু, বয়স ৩৫, উভয়েই জাতিতে চণ্ডাল। উহারা শেষ রাত্রে মৎস্য ধরিতে বাহির হইয়াছিল। উহারা মৎস্য ধরিয়া নৌকায় নৌকায় বিক্রয় করিত। অদ্য প্রমথনাথকে নূতন লোক দেখিয়া, 'বহুনির' বড় সুবিধা ভাবিল। সেই সময় প্রমথনাথ তটে নামিবার জন্য নৌকার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। খরিদ্দার চলিয়া যাইবে বুঝিতে পারিয়া, মধু তাড়াতাড়ি নিজের ডিঙ্গি হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাবু মহাশয়, বাবু মহাশয়! এইমাত্র জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়াছি। খুব টাটকা, ধরে নেন জলেই আছে। পয়লা আপনার হাতেই বহুনি করিব।" এই বলিতে বলিতে মধু ডিঙ্গি লইয়া, আরও অগ্রসর হইল।

প্রমথনাথ নিজের নৌকা হইতে বলিলেন,—"এখন মাছ লইয়া কি করিব? অগ্রে বাসার ঠিক করিয়া আসি; পরে লইব।"

মধু জিজ্ঞাসা করিল,—"আপুনি কোন্ গাঁ থেকে আসচো?"

"অনেক দূর!"

"তবু?"

"গোবৰ্দ্ধনপুর।"

"এখানে কি দরকার?"

"আমার স্ত্রীর চক্ষুঃপীড়া হইয়াছে—তাহাই চিকিৎসার জন্য।"

"এখান থেকে কি ডাক্তার নিয়ে যাবেন?"

"না, আমার স্ত্রীকে আনিয়াছি। এই স্থানে বাসা করিয়া, চিকিৎসা করাইব।"

"কোন্ ডাক্তারের কাছে?"

"ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যালের কাছে।"

"ব্যাট্‌বল ম'শায়ের কাছে? তিনি তো এখানে এখন নাই!"

এই কথা শুনিয়া, প্রমথনাথ চমকাইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন,—"তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"এখান থেকে তিন দিনের পথ—হরিহরপুরে দোলগোবিন্দ রায় জমীদারের বাড়ী।"

"কবে আসিবেন?"

"আজ প্রায় দশ-বারো দিন গিয়েছেন; আর পাঁচ-ছ' দিনের মধ্যেই আস'বেন।"

"তবেই তো মুস্কিল! এখন কি উপায় করি?"

"তার জন্য ভাবনা কি? আপনার নাম কি বাবু?"

"প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"পেরণাম হই, ঠাকুর। কোন ভাব্‌না-চিন্তে নেই; আমিই আপনকার বাসা ঠিক ক'রে দেব। সঙ্গে আর কে কে আছে?"

"আমার কনিষ্ঠ সহোদর অক্ষয়কুমার, আর একটি ঝি।"

এই বলিয়া, আবার বলিলেন,—"কোথায় বাসা ঠিক কর্‌বে?"

"আমার নিজের বাড়ীতে।"

"তোমরা কি লোক?"

"এজ্ঞে, নমঃশূদ্দুর।"

"তবে তোমার বাড়ীতে কিরূপে থাকিব?"

"বিদেশ-বিভূঁয়ে দোষ নেই, বাবু! আলাদা ঘরে পরিবার নিয়ে থাকবে; আমাদের সঙ্গে লেপ্‌চো কি? বিশেষ, এ দেশে, আপনার লোকজন না থাক্‌লে, বিদেশী লোকের

থাকবার সুবিধে নেই। আর এক কথা, আমার বাড়ীতে অনেক সময় বামুন-কায়েতরাই বাসা ক'রে থাকে।"

প্রমথনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে—আপদ্-কালে নিয়ম-ভঙ্গ করিলে দোষ নাই; সেই কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি মধু মাঝির বাড়ীতেই বাসা করিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন। একবার নৌকার 'ছৈয়ের' ভিতরে গিয়া, স্ত্রীর অভিপ্রায় জানিলেন। সরোজিনীও স্বামীর মতেই মত দিলেন।

তার পর সমস্ত ঠিক হইল। মধু, সিধুকে নৌকায় রাখিয়া, প্রমথনাথ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া, আপনার গৃহে গমন করিল দুই জন দাঁড়ী, প্রমথনাথের সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মধু মাঝির বাড়ী, হরিষপুরের প্রান্তভাগে, অমলা নদীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। সর্ব্বসমেত তিনখানি খ'ড়ো-ঘর। এক খানিতে মধু মাঝি সস্ত্রীক বাস করে। সেই ঘরখানির পার্শ্বে, ছোট একখানি রসুই-ঘর। ঐ দুইখানি ঘরের প্রায় ২০।২ হাত দূরে আর একখানি ঘর। সেই ঘরে প্রমথনাথের বাসা হইল। প্রমথনাথ দাঁড়ী দুইজনের হস্তে নৌকাভাড়া দিয়া বিদায় দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,—"বাড়ী ফিরিয়া যাইবা সময়, সুবিধা হইলে, এইখান হইতেই নৌকা করিয়া যাইব নতুবা তোমাদের পত্র দিব।" দাঁড়ী দুইজন, ভাড়া লইয় প্রমথনাথকে প্রণাম করিয়া, নৌকায় ফিরিয়া গেল।

দেশের নৌকা দেশে ফিরিয়া গেল; কেবল হরিষপুরে প্রমথনাথেরা চারিজন বিদেশী হইয়া রহিলেন। দেশের লো

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদেশে গেলে, যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যাঁহারা ভুক্ত-ভোগী, তাঁহারাই জানেন। প্রমথনাথকেও সেই ভোগ ভুগিতে হইল। তাহার উপর আবার সঙ্গে—রুগ্না সহধর্ম্মিণী। যাই হোক, তথাপি সস্ত্রীক মধু, যত দূর তাহার পক্ষে সঙ্গত, প্রমথ-নাথের সেইরূপ সাহায্য করিতে লাগিল। অক্ষয়কুমার রন্ধন-কার্য্যের ভার লইল, বৃদ্ধা তারামণি রন্ধনের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল।

২

ঈশ্বরেচ্ছায়, স্থানপরিবর্ত্তনের গুণেই হউক বা ভাগ্য-বিবর্ত্তনের গুণেই হউক, সরোজিনীর চক্ষুঃপীড়া প্রায় অর্দ্ধেক সারিয়া উঠিল। সরোজিনী পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেকটা সুস্থা। প্রমথনাথের বিষণ্নমনে আনন্দের প্রসন্নভাব দেখা দিল। বৃদ্ধা তারামণি, সরলবিশ্বাসের আশ্বাসে, হরির-লুট, কালী-গঙ্গা-শিবের পূজা মানত করিল। সরোজিনীও অর্দ্ধ-স্বাস্থ্যলাভে পূর্ণ-আশ্বস্থ হইয়া, তারামণির মানত-মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। বাস্তবিক, আস্তিকদের রোগযন্ত্রণা বা মানসিক অন্য যন্ত্রণার অবসানের পন্থা দেখা দিলে, দেবতার প্রতি অচলা ভক্তির উদ্রেক হয়। আবার অনেক স্থলে এমনও দেখা যায়, লৌকিক ঔষধে রোগের কোনরূপ প্রতীকার

না হইলে, একমাত্র দৈবের কৃপায় অসাধ্য-সাধনও হইয়া থাকে। দৈবের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসই ইহার মূলকারণ।

অদ্য তৃতীয় দিবস। অপরাহ্ন সময়ে, মধুর স্ত্রী, নিজের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া, প্রমথনাথের গৃহের সম্মুখস্থ উঠানে বসিয়া, বৃদ্ধা তারামণির সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরোজিনী, গৃহদ্বারের আগড়ে ঠেস দিয়া পীড়িত চক্ষুর উপর একখানি হরিদ্রাসিক্ত বস্ত্রখণ্ড ঢাকিয়া, তারামণি-মধুপত্নী-সংবাদ শুনিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রশ্নোত্তরও করিতে লাগিলেন।

এই মহাসংবাদের সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল পাঠক-পাঠিকার বুঝিবার ও সুবিধার জন্য কিয়দংশ গ্রহণ করিলাম।

মধুর স্ত্রী তারামণিকে প্রশ্ন করিল,—"তোমার নামটি আবার ভুলে গেলুম।"

তারামণি হাসিয়া হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, তোমার বয়স দশগণ্ডা বছর, আমার সাড়ে তেরো গণ্ডা, তবু আমি একবার যা শুনি, জন্মেও ভুলিনি। তুমি পরশুদিন আমায় যা যা বলেছিলে, আমার মনে সব জেগে আছে।"

মধুর স্ত্রী বলিল,—"আচ্ছা, কৈ, বলতো শুনি?"

তারাবুড়ী তৎক্ষণাৎ, পাঠশালার স্মৃতিমান্ বালকের শতকিয়া-কড়ানিয়া আওড়াইবার ন্যায়, টপ্‌টপ্ করিয়া বলিল,—"তোমার নাম পরাণী, তোমার সোয়ামীর নাম মধু, তোমার বড়-বোনের নাম কুড়ুনী, ছোট-বোনের নাম সোহাগী।"

মধুপল্লী ওরফে পরাণী, হি হি করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মিশিমাজন-ঘসা খাসাখাসা কালো দাঁতগুলা, অপরূপ রূপ দেখাইয়া, আবার ওষ্ঠাধর-রূপ মাংসপেটিকার মধ্যে গা-ঢাকা দিল। পরাণী ক্ষণকাল ভাবিল। ভাবিয়া বলিল,—"তবু ছাই তোমার নামটি আমার পোড়া মনে আসে না। ইচ্ছে হয়, আমার এ নোড়ে-ভোলা মন-মুখপোড়াকে অম্লা-নদীর জলে ডুবিয়ে মারি।"

এইবার সরোজিনী হাসিলেন। অতি মৃদুমধুর হাস্য। সে সুন্দর হাস্যদর্শনে, পরাণীর বত্রিশ পাটী দন্ত আর কোনমতেই, অনেকক্ষণের জন্য পরাণীর মোটা মোটা ঠোঁট দুখানা ফাঁক করিয়া, চেহারা বাহির করিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পরাণী বলিল,—"আর যাও কোথা দিদি, তোমার নাম ম[illegible] হয়েছে।"

তারামণি।—কি, বল দেখি।

পরাণী।—তরুণী।

তারামণি।—অনেক তফাৎ এখনো, ফের ভেবে বল।

পরাণী।—তারিণী।

তারামণি।—কাছাকাছি, খুব ভেবে বল।

পরাণী।—নিস্তারিণী।

তারামণি।—আ আমার পোড়া কপাল রে! তরুণী, তারিণী, নিস্তারিণী নয়, আমার নাম তারামণি।' আমি গোয়ালার মেয়ে, কুলে আজ পাঁচ বছর বিধবা হয়েছি। দুঃখের কপাল, কি করি, পেরমোথো বাবুর আর আমার এই সরোজিনী মা-ঠাকু-

রূপের ধনেপুত্তুরে নক্ষীনাভ হোক জয়জয়কার হোক, দুবেলা পেটভোরে খেতে পাচ্চি, পর্‌তে পাচ্চি। ভগমানকে ডাক্‌ছি, আমার মা-ঠাক্‌রুণ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চোখের ব্যামো থেকে আরুগ্যির মুখ দেখুক।

পরাণী।—তোমার মা-ঠাক্‌রুণ ঠিক্ ঠাক্‌রুণই বটে। আমি ঢের ঢের ভরযুবতী সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমন নক্ষী পিতিমে কোথাও কখনও দেখিনি।

তারামণি।—তবু বোন্, পোড়া চোখের ব্যামোতে, মায়ের আমার সে ছিরি-ছাঁদ অদ্দেক নেই। এই সবে সতেরো বছরে পড়েছে, কিন্তু হতচ্ছাড়া রোগে যেন এই ক'মাসে মাকে আধবুড়ী ক'রে ফেলেছে।

পরাণী।—না না, ঠাক্‌রোণ আধবুড়ী হবে কেন, বেশ সোমোত্তো। আহা, রূপ তো নয়, যেন সাক্ষেৎ তিলোত্তমা অপ্সরী। পাঁচ দেবতার পাঁচপীরের দয়ায় মা-ঠাক্‌রুণ চট্‌ক'রে আরুগ্যি হবে, ভয় কি?

এমন সময়ে প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সরোজিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরাণী নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

তারামণি জিজ্ঞাসা করিল,—"ডাক্তোর বাবুর খবর কি?"

প্রমথনাথ উত্তর করিলেন,—"আজ আবার তাঁর বাড়ীর লোকেরা বলিল, আরও এক হপ্তা দেরি হইবে। ডাক্তার বাবু এইরূপ পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়াছেন।"

তারামণি গৃহপ্রবিষ্টা সরোজিনীর দিকে চাহিয়া, সদুঃখে বলিল,—"মা, এখনও তোমার কপালে কষ্টভোগ আছে।

ডাক্তোর আসে আসে ক'রেও আসে না। ডাক্তোর মিন্সেগুলোর দশাই ঐ—দয়া নেই, মায়া নেই, কেবল টাকা টাকা টাকা। এক-একটা ডাক্তোর আবার সাক্ষেৎ যমদূত; ওষুদ গিলিয়ে রুগীকে মেরে ফেলে, কিন্তু ভাজা-ইট আদায় ক'ত্তে ছাড়ে না।"

তারামণির "ভাজা-ইট" শব্দটা, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারকে হাসাইল। গৃহমধ্যে সরোজনীও নীরবে হাসিলেন। সে হাসি তারামণির চক্ষে পড়িল না; পড়িল কেবল—প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারের মর্দ্দানা-হাসি। তারামণি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তা তোমরা হাস্‌বে বই কি! যার কষ্ট, সেই বোঝে, ডাক্তোরেও বোঝে না, ডাক্তোরের রূপোর পিণ্ডী ভাজা-ইটও বোঝে না, আর তোমরাও বোঝো না।"

প্রমথনাথ হাস্যমুখে বলিলেন,—"বুঝি বাছা সব, কেবল বুঝি না তোমার ভাজা-ইট।"

তারামণি যেন একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—"ডাক্তোরের ডাইনে-বাঁয়ের বেহ্মাণ্ডীগেলা চল্‌চলে বগ্লীতে কত ভাজা-ইট গোঁজো, অথচ বোঝো না।"

প্রমথনাথ বলিলেন,—"ভাজা-ইট নয়,—ভিজিট।"

তারামণি।—আচ্ছা, ভিজিট—ভিজিট! তা ভিজুট খুব দেবো, শীগ্‌গির এসে রোগ্‌টা ভাল ক'রে দিক না।

প্রমথনাথ।—ভোগের শেষ না হ'লে, শুভযোগ হয় না। তা ঈশ্বরেচ্ছায়, আপনা-আপনি যখন কিছু কিছু সুরাহা দেখা যাচ্ছে, তখন আরও দিন-কয়েক একটু স্থির হয়ে থাকা উচিত। আমিও আজ, আমাদের কথা পাড়িয়া, ডাক্তার বাবুর লোকদের একখানা পত্র লিখ্‌তে বলেছি।"

'তা বেশ করেছো বাবা, কিন্তু ভাঙ্গা-ইটখেকো—আ মর্—ভিজুটখেকো ডাক্তোররা পাথুরে মন্দ।" এই বলিতে বলিতে, বৃদ্ধা তারামণি, হাঁটুতে হাতের ভর দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেখিতে দেখিতে, অপরাহ্ন, সন্ধ্যায় পরিণত হইল। সূর্য্যদেব, যেন পশ্চিম-দিকের শেষ-সীমায় গিয়া, আর পা বাড়াইবার স্থান না পাইয়া, দেহচক্রে মাটি কাটিয়া, পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যদেব, কয়েকটা জীব ব্যতীত, সমস্ত জীবের সর্ব্বসম্বল—বিশেষতঃ দিবাচর পক্ষিকুলের। পক্ষিকুল, সূর্য্যসম্বল হারাইয়া, অতি আকুলস্বরে বিলাপ করিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষ-শাখে আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিষপুরের গৃহে গৃহে, অমলা-নদীর নৌকায় নৌকায়, প্রদীপ জ্বলিল; প্রমথনাথের বাসাঘরেও, তারামণি প্রদীপ জ্বালিল। সকলের সন্ধ্যাহ্নিক-জপ সমাপ্ত হইল।

অনন্তর, অক্ষয়কুমার রসুই চড়াইয়া দিল। তারামণি যোগাড় করিয়া দিতে লাগিল। প্রমথনাথ গৃহাভ্যন্তরে, সরোজিনীর কিছু দূরে, উপবিষ্ট হইয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে, সকলের ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ



হরিবপুরের প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে থৈকলা গ্রাম। সেই গ্রামে যামিনীকান্ত দত্ত নামে একজন জমীদারের বাস। যামিনী বড়দরের জমীদার নয়, কিন্তু বড়াই দেখাইতে বেশ মজবুৎ। বিশেষতঃ ষড়রিপুর অন্তর্গত একটা বিষম রিপুর বশে পড়িয়া, অধমপ্রকৃতির জমীদারশ্রেণীর first-class deplomaholder।

থৈকলা গ্রামও অমলা নদীর তটে অবস্থিত। মধু মাঝিকে অদ্য সকালে প্রায় সাতটার সময় দেখা গেল। মধু মধ্যে মধ্যে যামিনীকান্তকে বড় বড় আণ্ডাওয়ালা তোপ্‌সে ও ইলিশ মৎস্য বিক্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু অদ্য সে মাছের ঝোড়া আনে নাই, একাকী আসিয়াছে, সঙ্গে নিধু নাই, আছে কেবল একগাছা বেঁশো লাঠি।

অমলা নদীর ধারেই যামিনীকান্তের বাস্তভিটা ও একটা মধ্যমগোছের বাগান। বাগানে একটা ঘাট আছে। সেই ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া, মধুমাঝি যেন কাহারও অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মুখভঙ্গীর সঙ্গে কি যেন একটা সঙ্গীণ চিন্তা জাগিয়া আছে।

এমন সময়ে বাগানের মধ্যে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। বেহুঁস্ মধুর হুঁস্ হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তিনটা মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে ঘাটের দিকেই আসিতেছে। মধু আরও

দুই ধাপ উপরে উঠিল। এখন মধুর হাতের লাঠি বগলে, আর হাত দুইটা একটা হইয়াছে—যাহাকে বলে কৃতাঞ্জলিপুট।

ত্রিমূর্ত্তি—অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নহেন—যামিনীকান্ত, কুঞ্জলাল ও গোঁসাইদাস। কুঞ্জলাল ও গোঁসাইদাস, যামিনীকান্তের একান্ত শান্তদান্ত জল-উঁচু-নিচু-কারী। যামিনীকান্তের বত্রিশ-পাটী তীক্ষ্ণদন্তমণ্ডিত মুখরূপ নরককুণ্ড হইতে দিনান্তে বিশ-ত্রিশ-দফা প্রাণান্তকর বাপান্ত শুনিয়া, তবে দুইবেলা দুইমুঠা মোটা চাউলের অন্ন জঠরানলে দগ্ধ করে।

মধু তাড়াতাড়ি অস্খলিত করপুটে যামিনীকান্তকে নমস্কার করিল। হঠাৎ বাম-বাহু-চাপিত বংশযষ্টি, ফাঁক পাইয়া, ঠক্ শব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। যামিনীকান্ত বিকট হাস্যে আস্য বিস্তার করিয়া বলিল,—'ও মধু, তোমার নমস্কারের ঘটায় লাঠি-গাছটা মাটীতে পড়্‌লো যে।"

মধুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই—মধু ঠিক্ উত্তর দিতে পারিত কি না, জানি না—কুঞ্জলাল বাবুজীকে মনের মত উত্তর দান করিল,—"হুজুর, মধো ব্যাটা নেহাৎ অসভ্য, কিরূপে আপনার ন্যায় মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ ক'র্ত্তে হয়, জানে না; তাই ওর লাঠিগাছটা সটান ভূমিতলে প'ড়ে সাষ্টাঙ্গে আপনাকে দণ্ডবৎ ক'রে, মধো ব্যাটাকে দণ্ডবৎ শিখিয়ে দিলে।"

যামিনীকান্ত আহ্লাদে হাসির তুফান ছুটাইল। গাছের পাখীগুলা, তাহার হাস্যহুঙ্কারে, আপনাদের মধুর ঝঙ্কার ভুলিয়া, ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া, কিচি-মিচি করিয়া, উড়িয়া পলাইল।

কুকণ্ঠ শিক্ষানবিশের বদ্‌সুরো সা-ঋ-গ-ম-সাধার ন্যায়, তারা-গ্রাম হইতে উদারার পর্দ্দায় সুর নামিবার মত, যামিনীকান্তের

অট্টহাস্য, কমিয়া কমিয়া, থামিয়া গেল। একটু দম লইয়া বলিল,—"মধু, কি মাছ এনেছ আজ ?"

মধু।—আজ আর বাজে মাছ এনে, আপনকার জিব খারাপ কর্‌বার ইচ্ছেটা হয় না।

যামিনী।—তবে খুব আচ্ছা মাছ এনে, আমার জীবকে রস-মুগ্ধ কর।

মধু।—খুব আচ্ছা মাছই জালে ফেলেছি, তেমন মাছ আপনি একদিনও জিবে দাওনি হুজুর। ঠিক দাম পেলে, ঠিক মাছ দিই।

যামিনী।—কি মাছ ?

মধু।—বেহদ্দ সুন্দরী।

যামিনী।—সুন্দরী! বেহদ্দ সুন্দরী! ব্যাপারখানা কি ?

মধু।—একটু আড়ালে আস্‌তে আজ্ঞে হ'লে বড় ভাল হয়।

যামিনী।—কুঞ্জ-গোঁসাইএর সন্দেহ ক'চ্ছো ?

অমনি তৎক্ষণাৎ গোঁসাইদাস জবাব দিল,—"আরে ছ্যা, আমাদেরও আবার সন্দেহ করে ? আমরা হুজুরের পেটের ছেলে-পিলের মধ্যে ধর্ত্তব্য ; বুঝলে হে মধু ?"

মধু।—আজ্ঞে, তা খুব বুঝি বই কি বাবু। হুজুর, আপনাদের পুষ্যি-পুত্তুরের চেয়েও বিশ্বেস করেন।

গোঁসাইদাস।—'পুষ্যিপুত্তুরের চেয়েও' মানে কি ?

মধু জুৎসই জবাব দিতে পারিল না দেখিয়া, যামিনীকান্ত তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্বপ্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে জ্বলন্ত প্রতিভা-প্রভায় জবাব দিল,—'পুষ্যিপুত্তুরের চেয়ে মানে—পুষ্যিশালা।'

কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাস দেঁতো-হাসি হাসিল ; নহিলে এখনি

ব্যাপারের চূড়ান্ত হইবে! মধুও অধোমুখে ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

আবার যামিনীকান্ত বলিল,—"কেমন কুঞ্জ, কেমন গোঁসাই, পুষ্যিপুত্তুরও যা, আর পুষ্যিশালাও তাই নয়?"

কুঞ্জ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"হাঁ হুজুর, চুলমাত্রও তফাৎ নেই। তবে কি না উভয়তঃ।"

যামিনী।—উভয়তঃ আবার কি?

কুঞ্জলাল।—পুষ্যিপুত্তুরগুলোর পক্ষেও পুষ্যিবাবা আর পুষ্যিশালা অতফাৎ।

যামিনী।—বড় বাড় বাড়্‌ছো যে?

কুঞ্জলাল।—(ভয়ে) দোহাই ধর্ম্মাবতার, বাড়ের মাথায় বিশ জুতো লাগান। এখনকার কথা নয়, আমাদের গাঁয়ের জিতু দালালের পুষ্যিপুত্তুর নীতু, তার পুষ্যিবাবা জিতুকে, ভেতু করবার জন্যে, মাঝে মাঝে "শালা" বল্‌তো।

যামিনী।—আর জিতু?

কুঞ্জলাল।—জিতু জুতিয়ে দিতো।

যামিনী।—তবে আমিও জুতুই?

কুঞ্জলাল ও গোঁসাইদাস।—(শশব্যস্তে) আজ্ঞে, হুজুর, আমরা আপনার শালার শালা তস্য শালা—পাঠশালা, গরুশালা গোশালা। আমাদের জুতিয়ে কেন নোংরে পড়বেন? আপনার হাতে এখনি খিল ধরবে হুজুর।

অমনি খিল্‌খিল্ করিয়া, যামিনীকান্ত হাস্যচ্ছটার ঘোর ঘটা দেখাইল। কৃত্রিম রাগটা যেন জল হইয়া, অমলা নদীর জলে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বাবু-মোসাহেব-সংবাদ চলিয়া বন্ধ হইল। এইবার যামিনীকান্ত আবার মধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তোমার মৎস্য-সুন্দরীর বেওরাখানা কি, খুলে বল।"

মধু-মাঝি একে একে তাহার বাটীর বিদেশী নূতন ভাড়াটিয়া প্রমথনাথের পত্নী সরোজিনীর বয়স ও রূপের বর্ণনা করিল।

যামিনীকান্ত আর যায় কোথা? একেবারে দুর্দ্দান্ত রিপুর পদাঘাতে, নিতান্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। আর নিমেষটুকুও তর সয় না, সর্ব্বাঙ্গ জরজর, অন্তরাত্মা থরথর, প্রাণ-মন-হৃদয় গরগর। সৎকার্য্যে এক কড়া কাণাকড়ি ব্যয় করিতেও যে যামিনীকান্তের যুক্তহস্ত মুক্ত হয় না, সেই নরপিশাচ যামিনীকান্ত মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"মধু, মধু, আজই রাত্রে তাকে চাই। যত টাকা লাগে, কুছ্ পরওয়া নেই। কিন্তু আজি চাই, নিশ্চয় চাই।"

কুঞ্জলাল সময় বুঝিয়া, মুখ খুলিল,—"মধু হে, আজ মহেন্দ্র-ক্ষণে ঘাটে পা ঠেকিয়েছিলে। ফাঁদে চাঁদ ধ'রে, এক হাত বেশ দাঁও মার্‌লে। আমরা শালারা, এক বেটীকেও পাইনি যে, এনে হুজুরের নজরে হাজির করি।"

গোঁসাইদাস একটা সাতগজী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির করিয়া, মনের ভাব জাহির করিয়া বলিল,—"কপালং কপালং মূলং।"

'এ সময়ে কেন বাজে কথা ক'চ্ছো, চুপ দাও না।" গোঁসাইদাসকে এই কথা বলিয়া, যামিনীকান্ত, মধুকে আবার বলিল,—"বুঝলে হে মধু, আজ্‌কের রেতেই চাই নিশ্চয়।"

মধু।—হুজুর, তার চিন্তে কি? আজ্‌কেই নিশ্চয়। তবে একটা নিবেদন, আমার মজুরিটে কি ওজনে দিতে হুকুম হয়?

যামিনী।—দশ টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, বল কি হুজুর? অমন পরী, কুল্লে দশ টাকা!

যামিনী।—আরে পাগ্‌লা, পরী এখন কত টাকায় রাজী হয়, তা তো ঠিক নেই, তাই তোমার মজুরী দশ টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, না হুজুর, ধম্মপথে কলিকালে শস্তায় হয় বটে, কিন্তু অধম্মের পথে খুব আক্রায় দর চড়ে। সে কথা, আপনি সমজদার লোক, আপনাকে বেশী বল্‌তে হবে কি?

যামিনী।—আচ্ছা, পনের টাকা।

মধু।—আজ্ঞে, না হুজুর।

যামিনী।—আঃ, হুজুর হুজুর ক'রে, তুমি তো ভাল গুজুর গুজুর স্থুরু ক'ল্লে দেখ্‌ছি।

মধু।—এর পর রেতের বেলায় আকাশের কোলে পুরোণো চাঁদ, আর নিজের কোলে নতুন চাঁদ দেখ্‌বেন; নতুন-পুরোণোয় মিলিয়ে নেবেন, কোন্ চাঁদ সরেস। আরও কিছু বাড়ুন, হুজুর।

যামিনীকান্ত নীরব। কুঞ্জলাল বলিল,—"হুজুর, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌বেন না। তোমেরি অন্ন ছড়িয়ে ফেল্‌বেন না। মধুকে না হয় আর একটা টাকা বাড়িয়ে দিন, বস্, কর্‌কোরে ষোলো টাকা।"

মধু তবুও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"বাবুজী, এ তো আর জলের আঁস্‌টেগন্ধ মাছ নয়, থলের পদ্মগন্ধ অপ্সরী। আর কথা-কাটাকাটিতে দরকার নেই, হুকুম হয় তো বাড়ী ফিরি, হুজুর।"

যামিনীকান্ত দেখিল, সাবের মধুই আবার বিষ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মজুরীর ভাও বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইয়া বলিল,—"আচ্ছা, পুরোপুরি কুড়ি।"

তবুও মধো ব্যাটার মন ওঠে না। কিন্তু ওদিকে আবার ভয়, পাছে যামিনীকান্ত চটিয়া "না তবে দরকার নেই" বলিয়া ফেলে। সুতরাং কুড়ি টাকাতেই 'বিট্‌গিরি' করিতে ব্যাটা সম্মত হইল।

যামিনীকান্তও, শান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া মধুর হস্তে দিয়া, বায়না করিল।

তার পর মধুর সহিত যামিনীকান্তের, সরোজিনী-হরণের বিধি-ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। নরাধম, নরকের কীট, যামিনীকান্ত যেমন রাবণ; তেমনি বিজাতীয় ঘৃণার প্রতিমূর্ত্তি মধো চণ্ডাল ব্যাটা, মারীচ। আর মলভুক নরপশু কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাস, দুটো তো উপযুক্ত মন্ত্রী শুক-সারণ আছেই।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া পরামর্শ আঁটা হইল। বেলা নয়টার সময়, মধু-মাঝি, ঘাটে নামিয়া, নিজের জেলে-ডিঙ্গী চড়িয়া, বাড়ী ফিরিল।

যামিনীকান্তের সে দিবস মধ্যাহ্নে আর ভাল করিয়া অন্ন রুচিল না। কিন্তু কুঞ্জলাল আর গোঁসাইদাস, বেশ করিয়া গোগ্রাসে পুরা গ্রাস তুলিয়া সেয়ানার কাজ সারিয়া লইল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মধু-মাঝি আর ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যালের বাটীর কয়েকজন লোক ব্যতীত, প্রমথনাথের আর কেহ পরিচিত ব্যক্তি হরিষপুরে ছিল না। প্রমথনাথ, যেমন প্রত্যহ এক-একবার উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটী যান, অদ্যও সন্ধ্যার সময় তেমনি গিয়াছিলেন, অধিকন্তু অদ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন অক্ষয়কুমার। ঘটনাক্রমে, অদ্য সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিতে পারেন নাই। ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে, বৈঠকী গাওনা হইতেছিল বলিয়া, ডাক্তার বাবুর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অনুরোধে, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমারকে, অনুরুদ্ধ হইয়া, গান শুনিতে হইয়াছিল। সুতরাং বাসায় ফিরিতে বিলম্ব হইল। মধু মাঝির বাড়ী, অর্থাৎ প্রমথনাথের বাসা হইতে ডাক্তার বাবুর বাড়ী, প্রায় এক পোয়া পথ দূরে।

প্রমথনাথ, গান শুনিতে শুনিতে, দেওয়ালের ব্র্যাকেটস্থিত ক্লকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, প্রায় নয়টা বাজে। বেশী রাত্রি হইল বলিয়া, প্রমথনাথ, বাসায় ফিরিবার নিমিত্ত আবার বিদায় চাহিলেন। বাস্তবিক রাত্রি বেশি দেখিয়া, ডাক্তার বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের চারিজনের উপযুক্ত উত্তমোত্তম এক চাঙারি লুচি-কচুরি ও মিষ্টান্ন দিলেন। প্রমথনাথ, চাঙারি লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তার বাবুর পুত্রাদি বুঝাইয়া দিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন বাসায় ফিরিয়া

গিয়া রসুই-বাসের সুবিধা হইবে না। প্রমথনাথ, অগত্যা, ভোজ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া, কনিষ্ঠের হস্তে দিলেন। অনন্তর উভয় সহোদরে বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে, হঠাৎ ডাক্তার বাবুর বাটীর বহির্দ্বারে একটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ওদিকে, ভিতরের বৈঠকখানায়, বৈঠকী-সঙ্গীতের মনোহর সুধার-ধার ; আর এদিকে, বাটীর দ্বারদেশে, নারীকণ্ঠে হাহাকার। সুতরাং, শ্রোতাদের যেন, সুস্বপ্ন, অকস্মাৎ দুঃস্বপ্নে পরিণত হইল।

তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, বৈঠকখানা ছাড়িয়া, দ্রুতবেগে সকলে বহির্দ্বারে দৌড়িয়া আসিলেন। সঙ্গে প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার। ভোজ্যপাত্র, বৈঠকখানার এক পার্শ্বেই পড়িয়া রহিল।

বহির্দ্বারে কে উন্মত্ত আর্ত্তনাদে, স্বহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, পরহৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে? প্রমথনাথের মাতৃস্বরূপিণী সেই বৃদ্ধা দাসী—তারামণি।

উন্মাদের জীবন্তমূর্ত্তি তারামণিকে দেখিবামাত্র, প্রমথনাথ এবং অক্ষয়কুমার যেন, স্বচ্ছ আকাশ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন, হৃৎপিণ্ডে ঘনঘন ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল, আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, স্বর বন্ধ হইল।

প্রমথনাথ, আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, কম্পায়মান কলেবরে, ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঝি, ঝি, ব্যাপার কি? হয়েছে কি? সরোজ কেমন আছে?"

"বাবা রে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোর সরোজকে হারিয়েছি রে!". বৃদ্ধা, বক্ষে নিদারুণ করাঘাত করিতে করিতে, আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, দশদিক যেন শূন্য হইয়া গেল। সহসা দুই সহোদরের চক্ষে হুহু করিয়া অশ্রু ছুটিল। তদ্দর্শনে, অপর সকলেও, ব্যাকুল ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, চিত্রপটবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, প্রমথনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরোজকে হারিয়েছ কি? বল্‌ছো কি? কিছুই বুঝতে পারিনে যে। শীগ্‌গির সব খুলে বল।"

এই কথা বলিতে বলিতে, প্রমথনাথ, তারামণিকে উঠাইয়া বসাইল।

তারামণি অশ্রূচ্ছ্বাসে মর্ম্মোচ্ছ্বাস মিশাইয়া, ঘনঘন নিশ্বাস-পাতে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমার সরোজ ঘুমুচ্ছিলো, আমি কাছে ব'সে আহ্নিক ক'চ্ছিলুম। তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। মধু আর তার বৌ পরাণী, তাদের ঘরের দাওয়ায় ব'সে গল্প ক'চ্ছিলো। এমন সময়, নিধে দাঁড়ী এসে ব'ল্লে, পরাণীর বড়-বোনের বড় বিয়ামো হয়েছে, শীগ্‌গির ডাক্‌ছে। পরাণী, মধুকে ব'লে, নিধের সঙ্গে তার বড়-বোনের বাড়ী চ'লে গেল। তারপর মধু একবার বাইরে গেল। খানিক পরে ফিরে এসে, নিজের ঘরে গিয়ে শুলো।

"এমন সময়, হঠাৎ কতকগুলো জোয়ান জোয়ান মানুষ, হুড়মুড়িয়ে বাড়ীর ভেত্তোর ঢুকে পড়্‌লো। মধু বোধ হয়, সদর-দোর বন্ধ করেনি। লোকগুলোকে দেখে, আমার ভয় হলো, মধু মধু ক'রে চেঁচাতে লাগলুম, মধুর সাড়া পেলুম না।

"ওগো, তারপর বিষম সর্ব্বনাশ! সেই ডাকাতের মত লোকগুলো তড়বড়িয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। মায়ের

আমার তখন গোলমালে ঘুম ভেঙেছে। মা আমার একে ভয়কাতুরে, তার ওপর সেই দুষ্‌মন্‌গুলোকে দেখে, দারুণ ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। ঘরের আর দোর নেই, মা আমার ভয়ে জড়সড় হ'য়ে, একটা কোণে লুকুলো। হা, আমার পোড়া কপাল! কোথায় লুকুবে! রাক্ষসরা মাকে আমার ধ'রে গেলো, মা মূর্চ্ছো গিয়ে প'ড়ে গেলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে, দস্যিরে আমার মাকে কোলপাঁজা ক'রে তুলে নিয়ে, সাঁ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি বাধা দিলুম, বুড়ো-হাবড়া মেয়ে-মানুষ, মাকে কেড়ে নিতে পার্‌বো কেন? দস্যিরে আমায় মেরে আধমরা ক'রে ফেলে রেখে গেলো।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া, সকলে স্তম্ভিত হইল। প্রমথনাথ অস্থিরচিত্তে বললেন,—"মধু তবুও ঘর থেকে বেরুলো না?"

তারামণি।—না। তারপর যখন তারা আমার মাকে নিয়ে পালিয়ে গেলো, কোথায় গেলো তা জান্‌তে পারিনি, ও'বার শক্তি ছিল না, তাই জান্‌তে পারিনি, তখন মধু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আমার মুখে-চোকে জল দিলে। আমি কেঁদে কেঁদে বল্লুম, "মধু, তোমার বাড়ীতে, তুমি থাক্‌তে, এমন সর্ব্বনাশ হলো, আমার সরোজিনীকে লুটে নিয়ে গেলো। শীগ্‌গির এর উপায় কর, ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে খবর দাও।"

প্রমথ।—তার পর, তার পর?

তারামণি।—মধু বোল্লে, "এ যে দেখ্‌চি, ডাকাতির চেয়েও ডাকাত। কারা যে প্রমথনাথ বাবুর ইস্তরীকে, এমন ক'রে নে গেলো, কি ক'রে জান্‌বো? আমি বাড়ী ছেড়েই বা কি

ক'রে যাই? তুমি ডাক্তার বাবুর বাড়ী গে, তোমার মনিব্‌কে খবর দাও।" আমি বোল্লেম, তুমি থানায় যাও, দারোগা-চৌকিদারেরা খোঁজ করুক্। মধু ব'ল্লে, "ওগো তুমি বোঝো না, থানা-ফাঁনায় হিতে বিপরীত হবে; থানার লোক চোরকে সাধু, সাধকে চোর বানায়; তুমি এদেশের থানার লোক্‌কে চেনো না।" আমি বল্লুম, থানা-পুলিষ বই এ সর্ব্বনাশের বিহিত হবে না। তুমি না যাও, আমিই যাই। এখান থেকে কোন্‌দিকে থানা? কত দূরে?

প্রমথনাথ।—তার পর?

তারামণি।—মধু একটুখানি কি ভাবলে; ভেবে বল্লে, 'আচ্ছা, আমিই থানায় যাচ্চি। তুমি ঐ পুব্ব্‌দিকের পথ দে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে, ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাও। পথে গোলমাল ক'রো না। এ গাঁয়ের লোক সব বদ্‌মায়েস্‌।" মধুর কথায়, আমি খুঁজে খুঁজে দৌড়ে এসেছি। এখন শীগ্‌গির উপায় কর।

অনন্তর প্রমথনাথ, ডাক্তার বাবুর পুত্রাদির সহিত কি পরামর্শ করিয়া, প্রথমতঃ থানায় না গিয়া, সকলে মিলিয়া, তাঁহাদের সহিত তাড়াতাড়ি বাসায় দিকে ছুটিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। দিবসের সেই কোলাহল নিশীথিনীর গভীর গর্ভে বিলীন হইয়া, নৈরবের স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণা।

এমন সময়ে অমলা নদীর নীরব গর্ভে ক্ষেপণী নিক্ষেপের ঘনঘন শব্দ উত্থিত হইল। অমলার উভয় তটে নিবিড় শ্যামল জঙ্গল। একে অন্ধকার নিশা, তায় আবার সেই জঙ্গলস্থ পাদপশ্রেণী, অনন্ত শাখাপত্রপুঞ্জে অন্ধকারকে অধিকতর সাহায্য করিতেছে। অমলার অমল জলনিপতিত অন্ধকারাপেক্ষা, অমলার তটশোভিনী বনভূমি দ্বিগুণ তমোময়ী।

দেখিতে দেখিতে একখানা নৌকা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া দক্ষিণ-দিক হইতে উত্তরদিকে ছুটিতে লাগিল। এক্ষণে বুঝা গেল, পূর্ব্বের ক্ষেপণী-নিক্ষেপের শব্দ এই নৌকার।

নৌকায় আলোকের নামগন্ধও নাই। নৌকার ছৈয়ের ভিতর চারিটি লোক; তন্মধ্যে একটি যুবতী রমণী। রমণী কিন্তু মূর্চ্ছিতা। নৌকার বাহিরে পাটাতনের উপর তিনজন পাইক, তিনজন হিন্দুস্থানী দরওয়ান, চারিজন দাঁড়ী, আর পশ্চাতে মাঝি তো আছেই।

নৌকার মধ্যস্থিত তিনজন পুরুষ, মূর্চ্ছিতা যুবতীর চৈতন্য-সম্পাদনার্থ, ধীরে ধীরে মুখ-মস্তকে জলসেক ও তালবৃন্ত ব্যজন

করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতীর হৃতসংজ্ঞা আহৃত হইল। যুবতী, ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া, কষ্টব্যঞ্জক ও ভগ্নস্বরে বলিল,—"আমি কোথা? আমার স্বামী কোথা? আমার ঠাকুর-পো কোথা? তারামণি কোথা? এ কি মধুর বাড়ী? না, তা তো নয়—এ যে নৌকা!"

এক্ষণে বুঝা গেল, এই যুবতী রমণী—সেই প্রমথনাথপত্নী, সরোজিনী। কিন্তু এখনও যে বুঝিতে অনেক বাকি।

সরোজিনী, উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াই, মনে মনে কি ভাবিলেন। ভাবনার সঙ্গে নিদারুণ আশঙ্কা আসিয়া, তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়কে যার-পর-নাই আকুল করিয়া তুলিল। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবলার দুইটি বল—একটি জীবনসর্ব্বস্ব স্বামী, অপরটি রোদন। প্রথম বল হারাইয়া, পতিপ্রাণা সরোজিনী, প্রাণপণে বিপত্তারণ ভগবান মধুসূদন বলিয়া, চীৎকার আকুলপ্রাণে, অস্রধারায় চক্ষের জল ফেলিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন।

নৌকামধ্যস্থ তিনজন পুরুষের মধ্য হইতে একজন নানাবিধ মিষ্টবচনে সরোজিনীকে যতই সান্ত্বনা করিতে লাগিল, সরোজিনী ততই অশান্ত হইয়া উঠিলেন; সে যত অভয় দিতে লাগিল, সরোজিনী ততই ভয় পাইতে লাগিলেন।

কেন এমন ঘাতপ্রতিঘাত হইতে লাগিল? এ লোকগুলা কাহারা? বেশ বুঝা যাইতেছে, এই তিনটা পুরুষের মধ্যে যে লোকটা সরোজিনীকে সান্ত্বনা করিতেছে, অভয় দিতেছে, সেটা সেই থৈকলা-গ্রামের দুর্দ্দান্ত শয়তান যামিনীকান্ত দত্ত; তার পার্শ্বে বসিয়া যে লোক-দুইটা সরোজিনীর সেবাশুশ্রূষায়

নিযুক্ত, সে দুইটার একটা উক্ত শয়তানের পুষিশালা কুঞ্জলাল, অপরটা গোঁসাইদাস। যখন গভীর রজনী সেই রজনীর অতি গাঢ় অন্ধকারে অমলা নদীর জলে নৌকা, সেই নৌকায় পতিহারা সরোজিনী, তখন এ অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পাপিষ্ঠ চণ্ডাল মধ্যে ব্যাটাই এই ভয়ঙ্কর শোচনীয় ঘটনার মূল। কিন্তু সে ব্যাটা নৌকায় নাই। নৌকায় আর যে কয়েকটা লোক আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

অবৈধকামলালসাবিমুগ্ধ যামিনীকান্ত, প্রাণপণ যতনে, নানবিধ সান্ত্বনা, অভয়, সাহস, অবশেষে প্রলোভন, এমন কি জগদব্রহ্মাণ্ড দানেও, সরোজিনীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিল। সরোজিনীর পায়ে ধরিয়া, নিজের যাবজ্জীবনের গোলামী পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া, রকম রকম শপথ করিতে লাগিল। নরাধম পাষণ্ডের দুই-চারিটা শপথের মুখবন্ধ, বিষ্ঠার অপেক্ষাও অপবিত্র। দুরাত্মা যামিনীকান্ত সরোজিনীর পদস্পর্শ করিয়া, (সরোজিনী কিন্তু পা গুটাইয়া লইলেন, অপবিত্র নরশূকরকে পা ছুঁইতে দিলেন না) এই এই শপথ করিল,— সত্য সত্য বলছি, তোমার উপর যদি আমার কোন কুমৎলব থাকে, তবে আমার বাপের মুখে কুত্তার বিষ্ঠা পড়ুক, আমার বাহান্ন পুরুষ নরকস্থ হ'য়ে নরকবিষ্ঠা ভক্ষণ করুক্!"

ধিক্ তোকে নরবরাহ! তুই কেবল একা নহিস্, এই ভূমণ্ডলে তোর মত শত শত পরনারীহারী মহানারকী, এইরূপ এবং অন্যরূপ অতি ঘৃণ্য শপথ করিয়া থাকে; শেষে কিন্তু বাস্তবিক তো হেন মহাপাপিষ্ঠ কুলাঙ্গারদের পাপে ভগবতী বসুমতী অসহ্য পাপভারে আক্রান্তা হইয়া পড়েন। সুতরাং সেইজন্য স্বয়ং ভগবানকে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

বলিতে বলিতে, সুভীষণ সুদর্শন চক্র ধরিয়া, পৃথিবীতে আসিতে হয়। আজিও তো সেই নিদারুণ দুর্দ্দিন উপস্থিত—সাধু-সাধ্বীর পরিত্রাণ চাই, দুষ্কৃতের বিনাশ চাই, ধর্ম্মসংস্থাপন করা চাই! অনাথা সাধ্বী সরোজিনী যে, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত—দুষ্কৃতের বিনাশাশায়, 'হে বিপত্তির মধুসূদন' বলিয়া, কৃষ্ণ হে, হরি হে, তোমায় বারম্বার ডাকিতেছে, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে! এই তো, অনাথ-অনাথার নাথ দীনবন্ধু হরি, তোমার আবির্ভাবের প্রকৃত সময় উপস্থিত।

রোরুদ্যমানা যন্ত্রণাময়ী সরোজিনীকে লইয়া, নৌকাখানা আরও বেগে চলিতে লাগিল। নদীর দুইতটে কেবল জঙ্গলের পর জঙ্গল, লোকালয় নাই। সুতরাং অনাথার নিদারুণ রোদন-নিনাদ কেবল সেই কয়েকটা পাপিষ্ঠের পাপ কর্ণ এবং নিস্তব্ধ দিগন্ত-আকাশ স্পর্শ করিতে লাগিল। সরোজিনীর বর্ত্তমান মনের ভাব ও অবস্থার তুলনা—সরোজিনীই। তুলনা দিবার অন্য বস্তু নাই, বর্ণনা করিবারও আমার শক্তি নাই।

নৌকাখান একটিবারও কোথাও থামিল না, অবিরাম গতি চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই ভয়ঙ্করী নিশায়, অমলা নদীর বক্ষে ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রবল স্রোত, অমলার জল-স্রোতের ন্যায় বহিতেছে। ওদিকে আবার এই সময়ে খৈকলা-গ্রামে আর একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একদল প্রবল ডাকাইত, প্রায় পঞ্চাশজন হইবে, সহসা খৈকলা-গ্রামের দুর্ব্বৃত্ত জমীদার যামিনীকান্ত দত্তের বাটী আক্রমণ করিয়া, ধনরত্ন ও অলঙ্কার লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। বড় বিষম কথা—অমন একটা জমীদারের বাড়ীতে ডাকাতি! কিন্তু বিষম কথা নয়—ঠিক সমুচিত ব্যবস্থা।

যামিনীকান্তের ভৃত্যগণের মধ্যে একটি লোক, প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টায় ছিল; কিন্তু সুযোগ পায় নাই। যামিনীকান্ত এক সময়ে সেই ভৃত্যটির কোন আত্মীয়কন্যার প্রতি অবৈধ ব্যবহারের চেষ্টা পায়। ভৃত্য কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া, কন্যার পিতাকে গোপনে সংবাদ দেয়। কন্যার পিতা অতি দরিদ্র; দরিদ্রের বিপদ পদে পদে, সুতরাং বর্ণনা করা বাহুল্য। তাহার কন্যাটি আবার বিধবা, বয়স পঞ্চদশ বৎসর, শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাকিবার সুবিধা ছিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, পিতা-মাতা ও নিজের মান-রক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া, কন্যাটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

উক্ত ভৃত্যের, সেইজন্যই যামিনীকান্তের উপর মর্ম্মান্তিক প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিহিংসা-সাধনের নিমিত্তই সে আজ পর্য্যন্ত মহাপাতকী যামিনীকান্তের পাপান্ন গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, নতুবা কোন্ দিন চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইত।

অদ্য সন্ধ্যার পর যামিনীকান্ত, তিনজন পাইক ও তিনজন পশ্চিমে দরওয়ান প্রভৃতির সহিত বাটী ত্যাগ করিলে, সেই ভৃত্য, গোপনে গ্রামান্তরে গিয়া, তাহার অনেকগুলি বিশ্বস্ত স্বজাতীয় ও অন্য জাতীয় লোককে এই সংবাদ প্রদান করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে ডাকাতি-ব্যবসায়-নিপুণ ও বলিষ্ঠ লোকেরা, প্রায় পঞ্চাশজন মিলিয়া, ঠিক অবসর বুঝিয়া, যামিনী-কালে যামিনীকান্তের বাড়ী লুঠ করিল। যে কয়েকটা অকর্ম্মা লোক সকর্ম্মার ন্যায় আপতিত ডাকাইতদিগকে বাধা দিতে গেল, নিজেরাই চৌচাপটে বাধা পাইল—বিষম আঘাতও পাইতে বঞ্চিত হইল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডাকাইতেরা, যামিনীকান্তের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার মাল লুঠতরাজ করিয়া, নিরুদ্দেশ হইল।

এখন, অন্দরমহলে স্ত্রীলোকদের কেবল হাহাকার ও ক্রন্দন-ধ্বনি। নারকী যামিনীকান্ত, আজ একটি সতী-সাধ্বী রমণীকে কাঁদাইয়া, নিজের বাড়ীশুদ্ধ রমণীগুলিকে কাঁদাইল। দেখা যাউক, আরও কি হয়।



2 32

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমলা নদীর দক্ষিণ তটের জঙ্গলে কোথা হইতে দুইটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া, বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তত্রস্থ নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে অনেকগুলি গরুবাছুর ও নরনারীর প্রাণ সংহার করিয়া, জঠরজ্বালা নিবারণ করিয়াছে। পাছে আরও জীবহত্যা ঘটে, সেই ভয়ে, তত্রত্য লোকেরা মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত করে। হাকিম সাহেব হুকুম দিলেন, কেঁদুয়া বাঘ দুইটাকে শিকারীরা বধ করিলে, সরকার হইতে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবে।

লম্বা বকৃশিশের লোভে শিকারীরা ইতস্ততঃ কেঁদুয়া বাঘ দুইটার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। অনুসন্ধান চলিতেছে—তিন চারি দিন।

অদ্য রাত্রে একদল শিকারী, (দলে প্রায় পনের জন লোক) দুইখানা নৌকা করিয়া, অমলা নদীর দক্ষিণ-তটের দিকে উপস্থিত। তাহারা, নৌকা বাহিয়া কতক দূর যায়, তটে নামিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে, এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দেখে, নিষ্ফল হইয়া আবার নৌকায় চড়ে, চড়িয়া কতক দূর গিয়া আবার ঐরূপ করে। ঐরূপে, অদ্য রাত্রে অমলার উল্লিখিত স্থানে উপস্থিত।

শিকারীরা এখনও তটে অবতরণ করে নাই। নৌকায় বসিয়া, গুড়ুক ফুঁকিতেছে—মৎলব আঁটিতেছে। দুইখানি নৌকায় দুইটা চৌপলিয়া হাতলণ্ঠন জ্বলিতেছে।

যাউক, তার পরের ঘটনা বলি। রোরুদ্যমানা সরোজিনী, জালবদ্ধা অনাথা হরিণীর ন্যায় যামিনীকান্তের নৌকায় পতিত হইয়া, কেবল ভগবানকে ডাকিতেছেন। যামিনীকান্তের নৌকা নদীর মধ্যস্থল দিয়া ছুটিয়াছে। যামিনীকান্ত, প্রাণমন এক করিয়া, পূর্ব্ববৎ সরোজিনীর সাধ্যসাধনা বা আরাধনা করিতেছে। ভক্তবিটেলের বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেই হয়।

এমন সময়ে, নৌকার বহিঃপট্ট হইতে একটা পাইক, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"হুজুর, নদীর দখিণ-পারে নৌকো আছে, নোক আছে, ঐ আলো দেখা যাচ্চে। আমাদের নৌকো, এপারের দিকে খুব শীগ্‌গির ভিড়িয়ে, গাড়ি দেওয়া কর্ত্তব্য।"

যামিনীকান্ত, এই নির্ঘাত কথা শুনিবামাত্র, চমকিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল—বাস্তবিক! তৎক্ষণাৎ দাঁড়ী-মাঝির উপর হুকুম-জারি হইল। দেখিতে দেখিতে নৌকা মুখ ফিরাইল।

পূর্ব্বোক্ত পাইক আবার বলিল,—"মা-ঠাক্‌রোণকে চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে মানা কর, হুজুর।"

হুজুর যামিনীকান্তও, ভ্যাবা-চাকা খাইয়া, পাইককে উত্তর দিল,—"আরে আমি তো মা-ঠাক্‌রোণকে একদম্ কাঁদ্‌তে মানা ক'চ্ছি—আমারও যে অরণ্যে কাঁদা সার হ'চ্ছে।"

পাইকের কথা শুনিয়া, বিপন্মগ্না সরোজিনী যেন মৃত দেহে দ্বিগুণ জীবৎশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, যেন অকূলে কূল পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া, অবগুণ্ঠনমধ্য দিয়া নদীর দক্ষিণ-তটে দৃষ্টিপাত করিলেন, আলোক দেখিতে পাইলেন; সেই আলোকের সঙ্গে যেন নিজের ভয়ঙ্কর

বিপদোদ্ধারেরও আলোক দেখিলেন। যতদূর শক্তি, ততদূর উচ্চৈঃস্বরে—"ওগো, আমায় রক্ষে কর, আমার জাতকুল যায়, বাঁচাও, বাঁচাও, আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় কেড়ে নিয়ে পালাচ্চে, ডাকাতের হাতে সতীর সতীধর্ম্ম যায় যায়, কে আছ দৌড়ে এস, অবলাকে বাঁচাও—বাঁচাও।"

দুর্ব্বলার কণ্ঠবল যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে নদীগর্ভ ও অনন্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বাতাসে সেই মর্ম্মোচ্ছ্বাস শিকারীদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সরোজিনী কিন্তু আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবারের মূর্চ্ছা আরও ভয়ঙ্করী।

আচম্বিতে এই লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, শিকারীরা চমকিয়া উঠিল। আর বিচার-বিবেচনা, ভাবা-চিন্তার অবসর নাই! উচ্চকণ্ঠে দুইজন শিকারী তৎক্ষণাৎ "ভয় নেই—ভয় নেই—মাঝি নৌকো থামা" বলিয়া চীৎকার করিল। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে, শিকারীদের দুইখানি নৌকা তৎক্ষণাৎ তীরবেগে অপর তীরের দিকে ছুটিল।

তদ্দর্শনে যামিনীকান্তের নৌকাও বেগে ছুটিল। কিন্তু দাঁড়ীরা অনবরত বেগে দাঁড় টানিয়া কাবু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার আকস্মিক আসন্ন বিপদ! সুতরাং ভয়ে কতকটা শিথিল হইয়া পড়িল। তবু যতদূর বাহুবল, ততদূর নৌকা ছুটাইল। মাঝি মরি-বাঁচি করিয়া, ধুঁকেধুঁকে হালে ঝিঁকে মারিতে লাগিল।

এদিকে শিকারীরা, জোর তেজে নৌকা চালাইয়া, অনেকদূর অগ্রসর হইল। এমন সময়ে হঠাৎ দুইজন শিকারী, বন্দুকের আওয়াজ করিল।

বন্দুকের আওয়াজে, যামিনীকান্তের আত্মাপুরুষ, নিদারুণ ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কুঞ্জলাল, গোঁসাইদাসও তথৈবচ। দাঁড়ী-মাঝিরা হাল-দাঁড় টানাটানির সঙ্গে দেহ-প্রাণের টানাটানিতে পড়িল। পাইক-দ্বারবানেরা হাতিয়ারে মজবুত বটে ; কিন্তু নিজেদের সঙ্গে বন্দুক নাই ভাবিয়া, ভয়ে-সাহসে জড়াইয়া পড়িল। হাতে ঢাল-সড়্‌কি লাঠি-সোটা আছে, তাই সাহস ; কিন্তু শত্রুনৌকায় বন্দুকের আওয়াজ, তাই ভয়।

আবার শিকারীরা বন্দুক ছুড়িল—এক দুই তিন আওয়াজ! তিনটা আওয়াজ যামিনীকান্তের কর্ণে যেন তিনটা বজ্রনিনাদ। এতক্ষণ একটি অসহায়া কুলকামিনীকে লইয়া, যামিনীকান্ত যেরূপ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ন্যায় বীরদর্প প্রকাশ করিতেছিল, এখন আর সেরূপ নাই। মহাবীর এখন পূরা-মাত্রায় অধীর, ততোঽধিক অস্থির।

যামিনীকান্তের অন্তরে কৃতান্তের ভয় তাণ্ডব-নর্ত্তন করিতেছে। যামিনীকান্ত 'ভগবান হা ভগবান" করিয়া, আঁকুপাঁকু করিতেছে। রে নরবরাহ, ভগবান যে এখন তোরও নয়, তোর বাবারও নয়! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট দিয়া, এখন নারায়ণকে ডাকিতেছিস্! পাষণ্ড, জানিস্ না কি, লক্ষ্মীনারায়ণে ভেদাভেদ নাই।

মূর্চ্ছিতা সরোজিনীর আর এখন সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। না থাকাই মঙ্গল। মূর্চ্ছাই এখন সতীলক্ষ্মীর একমাত্র দৃঢ় আবরণ—চেতনাই ভয়ঙ্কর মর্ম্মনিষ্পীড়ন।

শিকারীদের নৌকা প্রায় কাছাকাছি হইল। সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্ববৎ বন্দুক-গর্জ্জন। যামিনীকান্ত ভাবিল,—"এখনি

গুলি ফুটিয়া হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া যাইবে বা মাথার চাঁটি চটিয়া যাইবে, বেখোড়ে পড়িয়া মরিতে হইবে। বড় অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়া, পা বাড়াইয়াছি। এই মেয়েমানুষটো নেহাত অপয়া, ইহারই নিমিত্ত বন্দুকের গুলি চলিতেছে। কাজ নাই আর এটাকে নৌকায় রাখিয়া। ইহারই চীৎকারে, কি জানি কাহারা, আচম্বিতে বন্দুক দাগিয়া নৌকা ছুটাইয়াছে।”

এই ভাবিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিল,—“এ ছুঁড়ীকে জলে ফেলে দাও, ভার কমাও, জোরে নৌকা চালাও। এ অলক্ষ্মী—পিশাচী—সাক্ষাৎ মৃত্যু। একে মৃত্যুর গ্রাসে নিক্ষেপ ক’রে, আমায় মৃত্যুগ্রাস হ’তে বাঁচাও।”

একজন পাইক বলিল,—“ভয় কি হুজুর? যার জন্যে এত, তাকে জলে ফেল্‌বেন কেন?”

যামিনীকান্ত শশব্যস্তে বলিল,—“আরে তোমরা আপৎকালে কিরূপে উদ্ধার পেতে হয়, জান না। চোর যখন পশ্চাদ্ধাবমান লোকদের হাত থেকে পালাবার আর পথ পায় না, তখন নিরুপায় হ’য়ে উপায় করে—হাতের বামাল পশ্চাতে ছুড়ে ফেলে দেয়। লোকগুলা তাড়াতাড়ি মাল কুড়ায়, চোর চোঁ-দৌড়ে পগার পার।”

চোরে-চোরে-মাস্তুতো-ভাই কুঞ্জলাল-গোঁসাইদাস বলিয়া ফেলিল,—“ঠিক্, হুজুর, ঠিক্ কথা। হুকুম দেন তো আমরাই এ কাজ সারি।”

“ক’বার হুকুম? শীগ্‌গির শীগ্‌গির টেনে জলে ফেল। আমি বাইরে যা’ব না, গুলি ছুট্‌ছে।”

"আপনি কায়া, আমরা ছায়া ; আপনি না বেরুলে, আমরা বেরুই কি ক'রে ? বন্দুকের গুলি তো আর চাকর-মনিব বাছে না, ধর্ম্ম-অবতার।"

এই কথা শুনিয়া, যামিনীকান্ত চটিল। সপ্তমে উঠিয়া, গর্জ্জন-পরাক্রমে বলিল,—"তবে রে পাজী নিমক্‌হারাম বেটারা, সম্পদের ভাগী, বিপদের কেউ নও ? মনিবের অপমান ! মনিবের হুকুম রদ ! বদমায়েস বেটারা, বেরো আমার নৌকো থেকে।"

কুঞ্জলাল হাত-দুটি যোড় করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, তাই তো বল্‌ছি, এ বিপদে কি আপনাকে ছেড়ে বেরুতে পারি ? আপনিই আমাদের বিপত্তারণ মধুসূদন—আপনাকে ছাড়্‌লেই আমাদের বিপদ ! কিছুতেই ছাড়্‌বো না হুজুর।"

"হাঃ শালারা ছিনে-জোঁক।"

এই বলিয়া, যামিনীকান্ত পাইকদিগকে হুকুম দিল। তাহারা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, নির্দ্দয় মনিবের হুকুম বাহাল করিল—মূর্চ্ছিতা ব্রাহ্মণপল্লী সরোজিনীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। অমলার জলে নির্ম্মলা স্বর্ণপ্রতিমা জীবন্ত বিসর্জ্জিত হইল।

সরোজিনী নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ একটা উচ্চ শব্দ হইল। অমলা নদী যেন, নির্দ্দয়-হৃদয় যামিনীকান্তকে অভি-সম্পাত করিল, ভগবানকে ডাকিল, শিকারীদিগকে প্রবুদ্ধ করিল।

শিকারীদের নৌকাযুগলও প্রায় কাছা-কাছি। শিকারীরা দেখিল ও বুঝিল, একটি স্ত্রীলোককে শত্রুগণ নদীজলে ফেলিয়া দিল। শিকারীরা আরও সন্দিগ্ধ হইল।

তৎক্ষণাৎ শিকারীদের দুইখানি নৌকা, যেখানে শত্রুরা সরোজিনীকে জলে ফেলিয়াছে, সেইখানে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া

পড়িল। পাঁচ ছয় জন শিকারী নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িল। পাঁচ সাত ডুবে, ঈশ্বরেচ্ছায় মগ্নায়মানা সরোজিনীকে পাওয়া গেল। সকলে ধরা-ধরি করিয়া অচেতনা দেবীপ্রতিমাকে আপনাদের একখানি নৌকায় তুলিয়া শোয়াইল। চারিজনকে সরোজিনীর জীবন-রক্ষার ভার দিয়া, অপর নৌকায় অবশিষ্ট শিকারীরা আরোহণ করিয়া, যামিনীকান্তের নৌকার পশ্চাতে প্রবলবেগে ধাবমান হইল।

এখানে শিকারী-চতুষ্টয়, সেই গভীর নিশীথে, তাড়া-তাড়ি নদীর বাম-তটে নৌকা ভিড়াইয়া, তীরে নামিল। আপনাদের বস্ত্রাদি বিছাইয়া, তদুপরি হৃতচেতনা সরোজিনীকে আস্তে আস্তে শায়িত করিল। ভগবানের কৃপায় সরোজিনীকে বহুক্ষণ জল-মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয় নাই এবং মূচ্ছিত-দশায় জলমগ্ন হওয়ায় উদরে বেশী জলপ্রবেশও করে নাই। বিপন্নের সহায় ভগবান হরি—তাঁহার প্রেরিত দেবতুল্য শিকারীদের বিশেষ যত্নে সরোজিনীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নাসারন্ধ্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু ধীরগতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নষ্টবুদ্ধি দুষ্ট যামিনীকান্ত যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। সরোজিনীনুদ্ধিৎসু শিকারীগণকে দূরে ফেলিয়া, তাহার নৌকা দৌড়-পাড়ি দিল ; তবু কিন্তু আশামত কাজ হইল না।

এগার জন শিকারী অপর নৌকায় চড়িয়া, যেন বায়ুভরে পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া, আবার যেই কাছা-কাছি সেই কাছা-কাছি। যামিনীকান্তের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, কৃতান্ত যেন নিতান্তই তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে যেন "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' হইয়া পড়িয়াছে।

এমন সময়ে একজন বলিষ্ঠ শিকারী গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"এই শালা খুনেরা, মেয়ে-মানুষ খুন ক'রে, কোথায় পালাস্ ? এখনও নৌকা থামা ব'ল্‌চি, নৈলে গুলি ক'রে সব শালাকে খুন ক'র্‌বো।"

যামিনীকান্ত জীবিত কি মৃত বুঝিবার যো নাই—চক্ষে পলক নাই—মুখে শব্দ নাই—নিস্তব্ধ জীবিত শব।

আবার শিকারীদের সেইরূপ শাসনগর্জ্জন। এমন সময়ে যামিনীকান্তের নৌকা হইতে একজন পাইক, সাহসে ভর করিয়া প্রতিগর্জ্জনে উত্তর করিল,—"আমরা খুনে, না তো শালারাই খুনে ? কারা, বন্দুক দাগছে রে শালারা ? এখনও বল্‌ছি প্রাণ চাস্ তো মানে মানে পালা।"

সেই শিকারী পাইকের অযথা ভৎসনায় অগ্নিশর্ম্মা হইল বিকট গর্জ্জনে বলিল,—"বটে রে শালারা! পথেও হাগ্‌বি, আবার চোকও রাঙাবি! খুঁন ক'ল্লি তোরা, আর খুনে হলুম মোরা! ধর্ম্ম সাক্ষী, খুনেকে খুন ক'ল্লে, স্বগ্‌গের দোর আপনি খোলে। এতক্ষণ তোদেরই ভালর জন্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেচি, এইবার কিন্তু পাকা আওয়াজ।"

ক্রমে উভয়-পক্ষের নৌকা খুব কাছাকাছি হইল। মধ্যে বড় জোর পনের-ষোল হাত ব্যবধান।

আবার এক সঙ্গে দুইটা বন্দুকের আওয়াজ, কিন্তু এখনও ফাঁকা।

আওয়াজ শুনিয়া, যামিনীকান্ত এবার নিশ্চয় করিল, আজ তাহার নির্ঘাত মরণ। প্রাণের মায়া মহামায়া; এই মায়া মানুষকে কখনও হাসায়, কখনও ভাসায়, আবার কখনও কাঁদায়, কখনও বাঁধায়। যামিনীকান্ত এই মায়ার ফাঁদে গলা জড়াইয়া, হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে, কুঞ্জলাল আর গোঁসাইদাসের গলা জড়াইয়া ধরিল। যামিনীকান্তের অন্তরস্থ উনপঞ্চাশ বায়ু যুগপৎ প্রবল হওয়ায়, সে এত জোরে সে দু'টার গলা চাপিয়া ধরিল, যেন দানোয় ধরিয়াছে। কুঞ্জলাল-গোঁসাইদাসও প্রাণের ভয়ে হতভম্ব হইয়াছিল, তাহার উপর আচম্‌কা চণ্ডের প্রচণ্ড কণ্ঠালিঙ্গনে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। তিন জনের হুড়াহুড়ির দাপটে নৌকা টলটলায়মানা।

নেহাৎ বেগতিক দেখিয়া, প্রভুভক্ত পাইক, প্রভুজীবনরক্ষার জন্য এবং শত্রুপক্ষকে ভয় দেখাইবার জন্য, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, সবলে একটা সড়্‌কি নিক্ষেপ করিল। বিদ্যুদ্‌গতিতে

সড়্‌কি ছুটিয়া আসিয়া, একজন শিকারীর বাহুপার্শ্ব দিয়া, সশব্দে নদীজলে মগ্ন হইল। তৎক্ষণাৎ আবার একটা সড়্‌কি ছুটিয়া আসিয়া নৌকার গলুয়ে বিঁধিয়া গেল। দৈবক্রমে কোন শিকারীর অঙ্গভেদ করিতে পারিল না। পারিবে কেন? স্বয়ং ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"কৌন্তেয় প্রতিজানাহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্তকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

এইরূপ সড়্‌কির উপর সড়্‌কি নিক্ষেপ দর্শনে, শিকারীরা আর অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না; আত্মরক্ষা ও দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবার নিমিত্ত, এইবার তাহারা গুলিভরা বন্দুক দাগিল। সড়্‌কিনিক্ষেপী পাইক, প্রথমে গুলির আঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া, নৌকার উপর পড়িয়া গেল; যেমন পড়া, তেমনি মরা। দেখিতে দেখিতে, আর একজন পাইক ও দুইজন দ্বারবান পঞ্চত্ব-লাভ করিল। একজন দাঁড়ী বিদীর্ণমস্তক হইয়া, জলে পড়িয়া গেল। অবশিষ্টদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উঠিল। অবশিষ্ট দাঁড়ী-কয়জন ও মাঝি, প্রাণের ভয়ে হাল-দাঁড় ছাড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কর্ণধারহীনা নৌকা উন্মাদিনী হইল; তাহাতে আবার নৌকামধ্যে ত্রিমূর্ত্তির হুড়াহুড়ি, বাহিরেও হুড়াহুড়ি। নৌকা আর কতক্ষণ? সেও যেন উদ্‌ভ্রান্তদের উৎপীড়নে, টাল রাখিতে অসামাল হইয়া, কাইৎ হইয়া পড়িল। নৌকায় প্রবলবেগে জল উঠিল, নৌকা ডুবিয়া গেল। এখন রহিল কেবল—দুইখানি নৌকার একখানি।

নবম পরিচ্ছেদ

"এখানে মধুমাঝির মন বিচলিত হইল। তারামণির মুখে থানার কথা শুনিয়া, মধুমাঝি অত্যন্ত ভীত হইল। নিজে থানায় যাইব বলিয়া বৃদ্ধাকে ভুলাইয়া, ডাক্তার বাবুর বাড়ী পাঠাইল; কিন্তু নিজে থানায় গেল না। মধুর এখন অন্তরে বাহিরে ভয়—অনন্তব্রহ্মাণ্ড যেন সাক্ষাৎ ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি।

থানার ভয় যমালয়ের অপেক্ষাও বেশী, তা'তে আবার মধু মহাপাতকে পরিলিপ্ত।" সে আত্মরক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া, একটা বিচিত্র মৎলব আঁটিল। আর কালবিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, কেরোসিন্ তৈলের মশাল তৈয়ার করিয়া, নিজের ঘরে, রসুই ঘরে এবং প্রমথনাথের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। একে ঘর কয়খানা অতি পুরাতন, দরমার বেড়া পুরাতন, খড়ের চাল পুরাতন, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল। দেখিতে দেখিতে, ঘরগুলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যেখানে অনল, সেইখানেই অনিল; সুতরাং অনিলানললীলা প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রির অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া, সালোক ধূম, হু হু করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, মধুর নিজহস্তে নিজসম্পত্তি গৃহগুলি দগ্ধ করার উদ্দেশ্য কি?—আত্মদোষপ্রক্ষালন। মধু ভাবিল, যদি থানার লোকে তাহাকে উৎপীড়িত করে—মেয়াদ দেয়, তাহা আর পারিবে না। সে বলিবে, ডাকাতেরা শুধু প্রমথবাবুর সর্ব্বনাশ

করে নাই, আমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমার ঘর-দ্বার জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। দেখুন, পাঠক! পাপিষ্ঠের সাফাই! কুচক্রীর কুচক্র কেবল পরের সর্ব্বনাশ করে না, নিজের করে।

এইরূপে ধূ ধূ করিয়া ঘরগুলা জ্বলিতেছে, মধু বাহিরে—দূরে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে দেখিতেছে। এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে টাকা-ভরা গেঁজিয়ার কথাটা জাগিয়া উঠিল। সেই গেঁজিয়ায় তার মূলধন পুঁজিপাটা ত্রিশটি টাকা আছে—পূর্ব্বের পঁচিশটি, আর অদ্য প্রাতে যামিনীকান্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাঁচটি।

মধু এবার অস্থির হইল। ভাবিল,—"পোড়া ঘর পুড়ুক, টাকা থাক্‌লে আবার নূতন ঘর হইবে। কিন্তু টাকা যে বিছানার বালিসের তলে! এর পর দাঁড়াইব কোথায়!"

এই ভাবিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া, লম্ফ দিয়া, নিজের দহ্যমান গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এমন সময়ে, প্রমথনাথ ও অক্ষয়কুমার, তারামণি ও ডাক্তার বাবুর পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রাদির সহিত, সেথানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া, সকলেই ব্যতিব্যস্ত, ভীত, চমকিত। প্রমথনাথের বিপদের উপর বিপদ। কি করিবেন, কি বলিবেন, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে জ্বলন্ত গৃহাভ্যন্তর হইতে, অর্দ্ধদগ্ধ মধুমালি, বিকট চীৎকারে ছুটিয়া আসিয়া, বাহিরে আছাড় খাইয়া পড়িল। পরিহিত বস্ত্র তখনও তাহার শরীরে জ্বলিতেছে। টাকার গেঁজিয়া পায় নাই।

প্রমথনাথেরা আরও চমকিত হইলেন। প্রমথনাথ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"মধু, মধু! কি ক'রে পুড়ে গেলে?"

মধু নিদারুণ যন্ত্রণাসূচক স্বরে উত্তর দিল,—“নিজের-মহাপাপে! পাপীর শাস্তি পাপীর নিজের হাতেই, আমি তার সাক্ষী। প্রমথ বাবু! আমার দোষেই তোমার ইস্তিরীকে থৈকলা-গাঁয়ের জমীদার যামিনীকান্ত দত্ত নিয়ে পালিয়েচে। নৌকায় ক’রে নিয়ে গেছে। আর কথা কইতে পারিনে, বড় জ্বলচে, পুড়ে মলুম, জ্বলে মলুম, গেলুম, গেলুম, জল—জল—”

প্রমথনাথ এত যে বিপন্ন, তবু ক্ষণকালের জন্য, আত্মবিপদ ও দারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া, পরম শত্রু মধুমাঝির যন্ত্রণায় কাতর হইলেন। নিজে দৌড়িয়া গিয়া, অমলা নদীর-জলে নিজের উড়ানিখানি ভিজাইয়া, জল আনিয়া মধুর মুখে দিলেন। মধু জলপান করিল। জলপান করিয়া প্রমথনাথকে বলিল,—“তুমি দেবতা, আমি নরকের শয়তান। পৃথিবীর আগুনে পুড়ে মলুম, এইবার নরকের আগুনে চিরকাল পুড়িগে। উঃ, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—বাপ্ রে!”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, নারকী মধু নীরব হইল—ক্ষণনীরব নয়, চিরনীরব।

এদিকে প্রমথনাথেরা আর কালবিলম্ব না করিয়া, দুইখানা নৌকা অনুসন্ধান করিয়া, থৈকলা-গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। নৌকা সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল; সুতরাং রাত্রিও অধিক হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এখানে অমলা-নদীর তটে, দয়ালু পরোপকারী শিকারীদের সেবা-শুশ্রূষায়, মৃতপ্রায় সরোজিনী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। শিকারীরা 'মা মা' বলিয়া, তাঁহাকে অভয় ও ভরসা দিতেছে। এখন, শিকারীদের দুইখানা নৌকাই উপস্থিত এবং সমস্ত শিকারীও জমায়েৎ। তাহারা, সরোজিনীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে স্বস্থানে আনিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে, প্রমথনাথেরা নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। বিধির কৃপায় আবার হারানিধি মিলিল। পতি-পত্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন। অক্ষয়কুমার কাঁদিলেন। তারামণি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গীদের মধ্যেও কেহ কেহ কাঁদিল। সকলের চক্ষে ঝরঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতে লাগিল। অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য—যেন একটি দুঃখের মুক্তার সহিত একটি সুখের মুক্তা সারি বাঁধিয়া বক্ষঃস্থলে স্থান লইতে লাগিল।

অনন্তর প্রমথনাথ, ভগবান্‌কে শত শত প্রণাম করিয়া, শিকারীদিগকে শত শতবার আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলেন। সঙ্গে তেমন অর্থ নাই যে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেন। প্রমথনাথ বিমর্ষ হইলেন। শিকারীরা বুঝিল। একজন বলিল,—"আমরা বাঘ-ভালুক মেরে টাকা বকসিস্ নিই, কিন্তু মানুষ বাঁচিয়ে টাকা ছুঁই না। তুমি ভাব্‌চো কেন, ঠাকুর? বৌ নিয়ে ঘরে যাও।

আশীর্ব্বাদ কর, বাঘ-শালাকে যেন, আজ নয় কাল রেতে, মার্‌তে পারি।”

অনন্তর নিরানন্দ প্রমথনাথ, পূর্ণানন্দে সহধর্ম্মিণী সরোজিনী ও স্বদলে মিলিয়া, ডাক্তার বাবুর বাড়ী আসিলেন। আসিবার সময়, অমলার জলে নরকের শয়তান যামিনীকান্ত দত্তের লাশটা ভাসিয়া আছে, দেখিলেন।

ডাক্তারবাবুর পুত্রাদিরা দুর্বৃত্ত লম্পট যামিনীকান্তকে চিনিতেন। তাঁহারা প্রমথনাথকে লাশ চিনাইয়া দিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে দেখা দিয়াছে।

অনন্তর প্রমথনাথ, সরোজিনী, অক্ষয়কুমার ও তারামনি, ডাক্তারবাবুর পুত্রাদির পরামর্শে তাঁহাদেরই বাটীতে বাসস্থান লইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে আর থানা-পুলিষের হাঙ্গামা ঘটিল না।

যথাসময়ে ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল বাড়ী আসিলেন। আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু ঈশ্বরকে অনন্ত ধন্যবাদ দিলেন।

অনন্তর বটব্যাল মহাশয়, বিশেষ যত্নে, আপনার কন্যাজ্ঞানে, সরোজিনীর চক্ষুঃপীড়ার চিকিৎসা করিলেন। পীড়া কিছু কমিয়া, সেই নিদারুণ দুর্ঘটনায় আবার বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সুচিকিৎসক বটব্যাল মহাশয়ের চিকিৎসাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই সরোজিনীর পীড়িত চক্ষু আরোগ্যলাভ করিল। এখন সরোজিনীর দুইটি চক্ষুই যেন পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল-সরোজ।

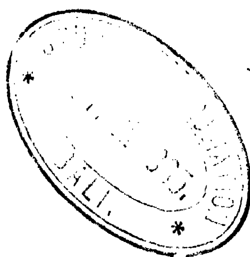
সরোজিনী, ডাক্তার বাবু ও তাঁহার পত্নী উমাসুন্দরীর সহিত ধর্ম্মপিতা-ধর্ম্মমাতা সম্বন্ধ পাতাইলেন। উপযুক্ত সম্বন্ধ—যাঁহারা প্রাণদান করেন, তাঁহারা পিতা-মাতার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

ডাক্তার বাবু, সরোজিনীর চক্ষুচিকিৎসার দরুণ কিছুই পারিশ্রমিক লইলেন না। বরং নিজের ব্যয়ে নৌকা ভাড়া করিয়া, জিনিষ-পত্র দিয়া, সঙ্গে লোক দিয়া, প্রমথনাথ প্রভৃতিকে গোবর্দ্ধনপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

পুনশ্চ;—হাঁ, একটা সু-খবর বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণ কেবল দুঃখের কথাই শুনিয়া আসিলেন; যদিও শেষটায় একটু সুখের কথা শুনিলেন বটে, তবু শেষের শেষটা আর একটু বেশী রকম সুখের কথা শুনা চাই! ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল মহাশয়, প্রমথনাথ অক্ষয়কুমার ও সরোজিনীর সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সরোজিনী তাঁহার ধর্ম্মকন্যা হইয়া একটী গুরুতর সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিলেন। তথাপি ডাক্তার মহাশয় তাঁহাদের সহিত যাহাতে একটা পাকা-পাকি সম্বন্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যবস্থাটি এই—অক্ষয়কুমারের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর পরবর্ত্তী শুভ-অগ্রহায়ণ মাসে অক্ষয়কুমারের সহিত সুশীলার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারেরা কুলীন

সুতরাং বলা বাহুল্য যে, মৌলিক ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যাল বিশেষরূপে জামাতার কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন ও আশাতীত যৌতুক দিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে "একযাত্রায় পৃথক ফল!" ইতি মধুরেণ সমাপ্তম্।



মাসিক উপন্যাস।]   অগ্রহায়ণ।   [দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

যামিনী

ও

লীলা।



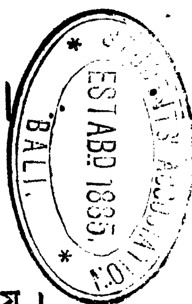
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত
প্রণীত

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
প্রকাশক,
'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়, ৮নং টেমার্স লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।

১৩০০ সাল।

৯৪।১নং লোয়ার সারকুলার রোড, অন্নপূর্ণা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
শ্রীবেণীমাধব ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

যামিনী।



প্রথম অধ্যায়।

যামিনীর পিতা কলিকাতায় চাকরী করিতেন। যামিনী একমাত্র কন্যা; সুতরাং অতি আদরে লালিতা-পালিতা হইত। তাহার মাতার নাম দেবদাসী। তিনি চলিত-রকম লেখাপড়া জানিতেন; সুতরাং যামিনীকে লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার বেস্ যত্ন ছিল।

যামিনীর পিতা হিন্দু কি ব্রাহ্ম ছিলেন, তাহা কেহ জানিত না; তবে দেশের যাবতীয় সৎকার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি যদিও সমাজে যাইতেন না এবং দেশে তাঁহার বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত না, তথাপি ব্রাহ্মসমাজে দান করিতেন, এবং অনাথা হিন্দু-বিধবাকে তীর্থাদি দর্শন করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

স্ত্রী-কন্যাকে জামা-পাদুকা ব্যবহার করিতে দিতেন, এবং বিশেষ বন্ধু-লোকের সহিত আলাপ-আপ্যায়িত করিতেও দিতেন। খরচ-পত্র চাল-চলন সকলই তাঁহার আধুনিক ঢঁচুদরের ভদ্রলোকের ন্যায় ছিল; সুতরাং যাহা উপার্জ্জন করিতেন, প্রায় সকলই ব্যয়

হইত। যামিনী পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স হইতেই স্কুলে যাইয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখিত।

এই সময়ে রামকৃষ্ণ নামে একটী দশ বৎসর বয়সের পিতৃমাতৃ-হীন বালক তাঁহাদের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত। দেবদাসী তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যামিনী ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বড় হইল। এখন যামিনীর বয়স ১৪ বৎসর, আর রামকৃষ্ণ ১৮ বৎসরের হইয়াছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসা—ভালবাসা প্রায় শেষ-সীমায় উপনীত হইয়াছে।

এখন দুই জন একত্র হইলে উভয়েই শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে। অথচ ভয় বা শঙ্কাজনক কোন কাজই তাহারা করিতেছে না।

যামিনী বড় চতুরা। একদিন সে শয়ন করিয়া আছে; সেই ঘরে দৈবাৎ অন্য কার্য্যে রামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে যামিনীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। যামিনী হাসিয়া তাহাকে বলিল,—"তুমি কি আমাকে দেখিয়া এমন ডরাও?"

রামকৃষ্ণ বলিল,—"চুপ কর—কেহ শুনিবে।"

যামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে রামকৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিল,—"তুমি আজ শুধু শুধু এত ভয় করিতেছ কেন—আমায় বলিতে হইবে!"

রামকৃষ্ণ বলিল,—"বোধ হয় আর একটু বড় হইলে তুমিও আমায় দেখিয়া ডরাইবে।"

যামিনী।—বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি। তা ডর-ভয় কি! তবে হঠাৎ নির্জ্জনে তোমাকে দেখিলে আমার একটু একটু গা কাঁপে—ইচ্ছা হয়—

যামিনী হাসিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ বলিল,—"কি ইচ্ছা হয়, যামিনী!"

যামিনী বলিল,—"তোমার ঐ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলগুলি বেস্ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিই।"

রামকৃষ্ণ সাহস পাইয়া বলিল,—"আমারও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ সীথায় খানিক সিন্দুর পরাইয়া দিই।"

এই সময় কাহার পদশব্দ হইল। উভয়ে ভয়ে ও নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবদাসী সকল কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। আকার-প্রকারেও বুঝিয়াছিলেন—যামিনী রামকৃষ্ণকে ভালবাসে। আর এখন তাহার বিবাহেরও বয়স হইয়াছে। তাই সকল কথা স্বামীর নিকট খুলিয়া বলিয়া অনুরোধ করিলেন,—"রামের সঙ্গে যামিনীর বিবাহ দাও।"

তাহার স্বামী হাসিয়া বলিলেন,—"কি বিবেচনায় একথা বলিতেছ?"

"কেন—দোষ কি ?

"অনেক দোষ।"

"কি দোষ ?"

"আমরা ব্রাহ্মণ, রাম শূদ্র।"

"তা দোষ কি ? না হয় দেশে যাব না।"

"দেশে না গিয়া চলিতে পারে, সমাজ ছাড়িতে পারি না।"

"অন্য সমাজ ত আছে ?"

"যদি একটা সমাজ ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে হইল, তবে যেটা আছে, সেই ত ভাল ?"

"তবে ত রামের সঙ্গে বিবাহ হইবে না ?"

"না হোক—সমাজে অনেক ভাল ছেলে আছে।"

"রামকে যে যামিনী ভালবাসে ?"

"ওটী ভালবাসা নহে—পিপাসা।"

"পিপাসা কিরূপ ?"

"বয়েস হইয়াছে—এ সেই বয়সের ভালবাসা ; এখন তাড়াতাড়ি সুপাত্রে বিবাহ দিলেই, আবার তাহাকেই ভালবাসিবে।"

"তুমিই ত বলিয়াছিলে, হিন্দুসমাজ ভাল নহে !"

"হাঁ, কোন কোন অংশে ভাল নহে, কিন্তু তুলনায় অন্যান্য সমাজ থেকে ভাল।"

"আমি ত দেখিতেছি, ইহাতে দোষই অনেক। স্ত্রীস্বাধীনতা নাই, কথায় কথায় জাতি যায়, অসবর্ণে বিবাহ নাই, বিধবা-বিবাহ নাই।"

"কিন্তু সেগুলি ভাল কি মন্দ, তা তুমি জান না। স্ত্রীস্বাধীনতায় সমাজ যে উচ্ছৃঙ্খল হয়, কলিকাতা ও ইউরোপাদির দৈনিক

পুলিশ-কোর্টের তত্ত্ব রাখিলে বুঝিতে পারিতে। জাতি-সম্বন্ধে হিন্দুরা অনুদার, তবে উদ্দেশ্য ভাল; পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই এ সকল বিষয়ে এতটা আঁটাআঁটি। অসবর্ণ বিবাহে, জাতীয় প্রকৃতি-আকৃতি, জাতীয় প্রতিভা, জাতীয় মহত্ত্ব ধ্বংস পায়; বিধবা-বিবাহেও সেইরূপ পতিভক্তি, স্নেহ ও পবিত্রতা ধ্বংস পায় এবং বিবাহ একটা ইন্দ্রিয়-সেবনের ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। বারাঙ্গনা আর বহুবার-পরিণীতা রমণীতে কিছুই প্রভেদ থাকে না।"

দেবদাসী হাসিয়া বলিলেন,—"তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমি হারি মানিলাম। এখন, যেখানেই হয়, শীঘ্র বিবাহটা দেওয়া চাই?"

তাহার স্বামী বলিলেন,—"এবার পূজার সময় বাড়ী যাইয়াই বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

"রামকৃষ্ণ কি করিবে?"

"একটী চাকরীর সুবিধা করিয়াছি, তাই করিবে।"

"কত পাইবে?"

"তিরিশ ৩০৲ টাকা।"

কয়দিন পরে রামকৃষ্ণ চাকরিতে নিযুক্ত হইল, এবং স্থানান্তরে থাকিবার স্থান-নির্দ্দেশ করিল।

—:—

চতুর্থ অধ্যায়

রামকৃষ্ণ আজি চারি বৎসর যাবৎ চাকরী করিতেছেন। এ অনুরোধের চাকরী, তাই টিকিয়া রহিয়াছেন। সওদাগর-আপিসের বড়-বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ; সেই অনুগ্রহেই রামকৃষ্ণের সাহস এবং কর্ত্তব্য-কার্য্যে তাচ্ছিল্য।

রামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। আপিসের কাজ তাড়াতাড়ি একরূপ নিঃশেষ করিয়া, কাগজ ও পেন্সিল লইয়া, আপনার লেখা লেখেন; লোকে দেখিয়া বিস্মিত হয়, আর মনে মনে ভাবে,— "হায় এমন চিন্তাশীল—এমন পণ্ডিত—এমন কবি—সে কেন কেরাণীগিরি করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে!"

রামকৃষ্ণ অনেকের মুখে অনেক সময় একথা শুনিতে পান— কেহ সরলান্তকরণে তাঁহার কবিতার প্রশংসা করে—কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন—যথার্থই তিনি একজন প্রধান-শ্রেণীর কবি—কেরাণীগিরিরূপ সামান্য ব্যবসা তাঁহার স্পর্শে সম্মানিত হইতেছে।

তাঁহার মনে মনে সাহস হইয়াছে, তাঁহার কবিতা বঙ্গভাষায় রত্নস্বরূপ হইবে—একদিন তিনি বাঙ্গলা-সাহিত্যে কালিদাস বলিয়া গণ্য হইবেন—বাঙ্গালী আদর করিয়া তাঁহার কবিতা-বহি কিনিয়া পড়িবে—তাঁহার মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি গঠন করিবে। সুতরাং তিনি কেন সামান্য কেরাণীর কাজে তাঁহার অমূল্য সময় ক্ষেপণ করিবেন?

বড়-বাবু কাজে বিলক্ষণ তাচ্ছিল্য দেখিয়া মাঝে মাঝে রাম-

কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন,—"মহাশয়, বেতন ত ত্রিশ, কত খাটা যায়?" আর বড়-বাবু যদি বলেন,—"এ ভাবে কাজ চলিলে এ ত্রিশও যে রাখা দায় হইবে!" তখন তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন,—"২৪ ঘণ্টা খাটিয়া একটা কবিতা লিখিলে, ১০৲ টাকা ত তার দাম হইবে?" বড়বাবু ঘৃণার-ভাবে হাসিয়া চলিয়া যান।

রামকৃষ্ণ, আপিসের কাজ "যেন তেন প্রকারেণ" নির্ব্বাহ করিয়া, একদিন কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন; এমন সময় ডাক-হরকরা একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি কবিতার পদ-পূরাণ করিয়া চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠির বিবরণ এই,—

"প্রিয় রামকৃষ্ণ বাবু!

পিতার মৃত্যুর পর মাকে আমার কাছে রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আমিও এখন বিধবা। মা ও আমি উভয়েই বড় কষ্টে আছি; ইচ্ছা হয়, তোমাকে একবার দেখি—আর তুমিও একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, আমরা কি দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি। তিন মাস হইল, আমরা তোমার কোন পত্র পাই নাই, সুতরাং শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীযামিনী দেবী।"

"বড় বড় কবিরা এবং দার্শনিকেরা অতি মহৎ, তাঁহাদের প্রাণ অতি উচ্চ, তাঁহারা অতি উদার, তাঁহারা পরদুঃখে অতি কাতর।" —রামকৃষ্ণের এই কয়টী কথা শুনা ছিল, অথবা তিনিও সেই শ্রেণীর একজন উদার লোক হইবেন; কেন-না, ঐ চিঠিখানি

পাইয়া, তখনই দুইখানি চিঠি লিখিলেন ও মণি-অর্ডার করিয়া ৫০ টি টাকা পাঠাইলেন।

প্রথম পত্র।

"যামিনী! হায়! তোমার পত্র পাইয়া প্রাণ অস্থির হইল—আর তোমাদের বিপদের কথা পড়িয়া একপ্রকার মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, সকলই বিধির বিধান, চিন্তা করিও না। আমি জীবিত থাকিতে কষ্ট পাইবে না। মা ও তুমি যত শীঘ্র পার, এইখানে চলিয়া আসিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী রাম।"

দ্বিতীয় পত্র।

"মাতঃ, পত্রে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না, আমার সময় অমূল্য, অল্প। দেশে থাকিয়া কষ্ট পাইবেন না। আমি আপনার জন্য বাড়ী ভাড়া করিলাম, যামিনীকে লইয়া আসিবেন—খরচ ৫০ টাকা পাঠাইলাম। কবে রওনা হইবেন, অগ্রে জানাইবেন।

সেবক শ্রীরামকৃষ্ণ দাসস্য।"

পঞ্চম অধ্যায়।

দেবদাসী পত্র ও টাকা পাইয়া যামিনীকে বলিলেন,— "তোমার পিতা আমাদের ভরণ-পোষণ জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তোমাকেও এমন ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন যে, এখন অন্নাভাবে ভিক্ষা করিতে হইবে—এই কয় মাস অনাহারে মৃতকল্প হইয়াছি। কলিকাতা যাই, রামকৃষ্ণ আমাদের মায়া-মমতা

ত্যাগ করিতে পারিবে না। বিশেষ, সেখানে তোমার পিতার অনেক বন্ধু আছে, আমরা বোধ হয় অনাহারে মরিব না।"

যামিনী বুদ্ধিমতী হইলেও, বিপদে এবং অন্নকষ্টে; মাতার পরামর্শ ভাল কি মন্দ—বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"মা, তুমি যদি যাও, তবে আমি আর কার কাছে থাকিব? উচিত হউক, অনুচিত হউক, আমিও যাইব।"

দেবদাসী বলিলেন,—"যাওয়াই স্থির। দেখ, আমরা দুঃখিনী; আমাদের এসংসারে কেহ নাই—রামকৃষ্ণেরও কেহ নাই, তাহাকে সন্তানের মত পালন করিয়াছি। আহা! যদি তোমার পিতা আমার কথা শুনিতেন, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, তবে আর এ দুঃখ হইবে কেন?"

মায়ের কথা শুনিয়া, যামিনীর চক্ষে জলধারা বহিল—তিনি বলিলেন,—"মা দুঃখে ও দারিদ্র্যেই লোকের জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়; ধর্ম্মের জন্য এজগতে কটা লোক জাতি, সমাজ ও স্বদেশ ছাড়িতে পারে? বাবা যখন ছিলেন, তখন দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল না; তাই তিনি তোমার কথা শুনেন নাই। তিনি ভালই করিয়াছিলেন, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!"

দেবদাসী বলিলেন,—"তা ঠিক্। আমিও আর দুঃখ সহিতে না পারিয়াই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি।"

যামিনীর মাতা, যাওয়ার দিনস্থির করিয়া, কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং যথা-সময়ে কলিকাতা রওনা হইলেন।

যামিনী কিছুই প্রতিবাদ করিলেন না; নীরবে মায়ের সঙ্গে কলিকাতা চলিলেন।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাতঃকাল। রেলওয়ে-ষ্টেশনে এখনও গাড়ি আসে নাই। আত্মীয়-স্বজনকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রমে দু'টী-একটী লোক ষ্টেশন-ঘরে কেবল আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুলিশম্যান এক-আধ জন অসতর্কভাবে এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে, ২২।২৩ বৎসরের একটী যুবাপুরুষ, ভাল কাপড় জামা ও পাদুকা পরিয়া, প্লাটফরমের এক কোনে দাঁড়াইয়া, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে পেনশিল দিয়া কাগজে কি লিখিতেছে। এত অন্যমনস্ক যে, চাদরের একপাশ স্কন্ধ হইতে লুটাইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছে। যুবাপুরুষের কেশকলাপ অসতর্কভাবে সুবিন্যস্ত, নাসিকাগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত চস্‌মা।

এদিকে ষ্টেশনে মহোৎসব উপস্থিত। লোকের কোলাহল, পুলিশম্যান ও কুলিগণের হাঁকাহাঁকি, ডাকা-ডাকি—বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে! রেল-আপিসের কোন কোন বাবু টেরি কাটিয়া মৃদুহাস্যে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া থামিল। আরোহিগণ অবতরণ করিয়া ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এখন ভিড় কমিয়াছে। বড় বেশী লোক নাই, কেবল দুইটী স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছেন, প্ল্যাট-ফরমের ইতস্ততঃ কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের সেই চিন্তামগ্ন যুবা-পুরুষ কিন্তু এখনও ধ্যানস্থ।

এই দুইটী স্ত্রীলোক অবশেষে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল,—"রাম, রাম!"

রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন;—"ওঃ! গাড়ি আসিয়াছে, আপনারা আসিয়াছেন, বেস্ বেস্! আমার অপরাধ লইবেন না—আমার একটী সুন্দর ভাব মনে হওয়াতে লিখিতেছিলাম, তাই এত অন্যমনস্ক। কবিদের এরূপ হইয়া থাকে, আমার দোষ কি, বলুন? যা'হোক, চলুন?"

রামকৃষ্ণ গাড়ি করিয়া আগন্তুক স্ত্রীলোক-দুটীকে লইয়া চলিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁরাই দেবদাসী এবং যামিনী।

রামকৃষ্ণ একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন, স্ত্রীলোক-দিগকেও তথায় লইয়া যাওয়া হইল।

কলিকাতায় পৌছিয়া, দেবদাসী এবং যামিনী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল রামকৃষ্ণের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া, মাঝে মাঝে ভীত হইতে লাগিলেন।

একমাস পরে একদিন শুনিয়া হতাশ হইলেন, রামকৃষ্ণ কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। সেইদিন হইতে তিন দিনের মধ্যে আর তিনি বাসায়ও আসিলেন না। দেখিয়া-শুনিয়া যামিনী বলিলেন,—"মা, এখন উপায়?"

দেবদাসী কি উত্তর দিবেন? স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

রামকৃষ্ণের কাজে তাচ্ছিল্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে অন্ধ আত্ম-বিশ্বাসে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব, তাহার অসাধারণ প্রতিভা, জগৎ সম্মান করিবে; তিনি সামান্য অর্থের দাস হইয়া আর আপিসের টুলে বসিয়া সময় নষ্ট করিবেন কেন?

ফরাসী-উপন্যাসকার ব্যালজাক্ প্রথমোদ্দমে নাটক লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, নাটক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; নাট্যশালার অধ্যক্ষেরাও তাহাই বলিল। ব্যালজাক্ তাহা বুঝিলেন। তিনি সে পথ ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে বসিলেন; এইবারে দেশময় "ব্যালজাক্" বলিয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রামকৃষ্ণ আশা করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াও একদিন কবিরাজ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। তিনি একদিন রত্ন-খচিত বেত্র চমকাইয়া যামিনীকে বিস্মিত করিতে পারিবেন। তাই তাঁহার এত সাহস ও কাজে এত তাচ্ছিল্য হইয়াছিল।

আপিসের বড়-বাবু একদিন দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"রাম, তুমি কাজে মনোযোগী না হইলে তোমাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইব।"

রামকৃষ্ণ তাহাতে হাসিয়া কহিলেন,—"ইহা অপেক্ষা মনোযোগ করিবার আমার গুরুতর বিষয় আছে।"

বড়-বাবু বলিলেন,—"তবে তোমার চাকরী ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।"

রামকৃষ্ণ আর ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন,—"আপনার চাকরী আমি আজ হইতে ছাড়িয়া দিলাম।"

বড়-বাবু বলিলেন,—"কবিতা লিখিয়া ভাত হইবে ত?"

রামকৃষ্ণ তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার-ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—"তা দেখা যাইবে।"

বড়-বাবু আর একটু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন,—"রাম, তুমি যে সকল কবিতা লিখিয়া ডেস্কে রাখিয়া যাও, তাহা আমি পড়িয়া দেখিয়াছি—তুমি কখন কবি হইতে পারিবে না।"

রামকৃষ্ণ অভিমানে স্ফীত হইলেন; তৎক্ষণাৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, কবিত্ব বুঝিবার শক্তি কেরাণীদের থাকিলে, আপিস স্বর্গ হইত।"

বড়বাবু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। আর রামকৃষ্ণ অপর কেরাণীদের নিকট আস্ফালন ও আত্মগৌরব করিতে লাগিলেন।

বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ এস্তফা-পত্র লিখিয়া দিয়া কার্য্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর তিন দিবসের মধ্যে তথায় কিম্বা বাড়ীতে ফিরিলেন না। তিনি প্রথমতঃ হস্তলিপিগুলি লইয়া, সহরের সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সন্দর্ভাদিপূর্ণ মাসিক ও পাক্ষিক পত্র প্রভৃতির সম্পাদকদের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার রচনা গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইহাতেও রামকৃষ্ণ দুঃখিত হইবার লোক নহেন—তিনি ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিলেন,—"যতদিন সুযোগ্য লোক দ্বারা দেশের কাগজ-

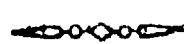
গুলি সম্পাদিত না হইতেছে, ততদিন উহা সাহেবদের 'কমোড্' ও বণিকের দোকান হইতে উচ্চস্থান পাইবে না।"

এইবার সংবাদপত্রে তাঁহার ঘৃণা হইল; কেননা, তাঁহার লেখা গৃহীত হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ঐ সকল কাগজের কঠিন সমালোচনা করিয়া সম্পাদকদিগকে জন-সমাজে অপদস্থ করিবেন। কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—তাঁহার সমালোচনা কোন কাগজেই মুদ্রিত হইল না। তখন দেশের সকল কাগজের উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ হইল। ভাবিলেন, স্বয়ং নূতন কাগজ বাহির করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করিবেন।

এই নূতন কল্পনায় নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, তিন দিবস পরে, রামকৃষ্ণ আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী ও তাঁহার মাতা দুঃখপ্রকাশ করিয়া কর্ম্মচ্যুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে হাসিয়া বলিলেন,—"এখন রামকৃষ্ণকেও দুই-তিনটা ৩০৲ টাকা বেতনের চাকর রাখিতে হইবে।"

শুনিয়া, দেবদাসী হর্ষযুক্ত ও যামিনী অধিকতর দুঃখিত হইলেন।



অষ্টম অধ্যায়।

যামিনী, রামকৃষ্ণের গতিক বড় ভাল নহে মনে করিয়া বুঝাইলেন—"চাকরী ছাড়া ভাল হয় নাই। খবরের কাগজে পয়সা হইবে না—আরও হাতের কড়ি খরচ হইবে।" কিন্তু রামকৃষ্ণ

তাহাতে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যামিনী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কষ্ট পাইবে না ; আমার দ্বারা তোমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইবে।"

যামিনী বলিলেন,—"সে সব কথা থাক্, তোমার হাতে ওগুলি কি?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"দশহাজার টাকার নোট।"

যামিনী হাসিতে হাসিতে সেগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"এই তোমার নোট নাকি?"

"তা বৈ কি! অমিত্রাক্ষর-ছন্দে চমৎকার দুইখানা নাটক লিখিয়াছি। থিয়েটরে অভিনয় করিতে দিলে বিস্তর পয়সা পাইব। তোমাকে অভিনয় দেখাইতে লইয়া যাইব—দেখিবে!" বলিয়া রামকৃষ্ণ কাগজগুলি চাহিলেন। যামিনী উহা তাঁহার হাতে দিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, দেবদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাম কি আজ আবার আসিবে?"

"তা কিছুই বলে যায় নাই!" বলিয়া, যামিনী চুপ করিলেন!

দেবদাসী বলিলেন,—"রাম বিবাহ করিলেই সংসারী হইবে—সব সুবিধা হইবে। যামিনী তুমি মত দাও।"

"বাবার মৃত্যু-শোক এখনও ভুলিতে পারি নাই।" এই বলিয়া, নিজের ঘরে যাইয়া, যামিনী দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ও কাজে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠক, মনে করিয়াছেন,—যামিনী রামকৃষ্ণের গলগ্রহ হইয়াছেন :ফলতঃ তাহা নহে। তাঁহার উপার্জ্জন রামকৃষ্ণের উপার্জ্জন হইতে এখন অনেক বেশী। তিনি ভাল শিল্পকার্য্য জানেন;

তিনি সারা-দিনরাত পরিশ্রম করিয়া, একমাসের মধ্যে, সূক্ষ্ম মলমলে লাল ও নীল সূত্রে নানারকম কাজ করিয়া, চারিথানি সাড়ী প্রস্তুত করিয়া ৩২৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। এবারে আরও কাপড়, সূতা, রেশম ও উল কিনিয়া নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় জন্য যামিনীকে কোথাও যাইতে হয় না। যামিনীর গৃহপশ্চাতে একটী অবস্থাপন্ন ভদ্র-পরিবার বাস করেন। সে বাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ে ও অনেকগুলি বউ। তাহাদের সঙ্গে যামিনীর অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছে। তাহারাই তাঁহার কাপড় কিনিয়াছে ও আরও প্রস্তুত জন্য ফরমাইস দিয়াছে। যামিনীর যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, বলিলে, বাড়ীরলোক দিয়া, তাহাও তাহারাই কিনিয়া দেয়। ইহা ছাড়া, তাহাদের পরিচিতা অন্য বাড়ীর মেয়েরাও ঐরূপ সাড়ীর ফরমাইস দিয়াছে ও ক্রমে আরও দিবে। সুতরাং তাঁহাকে এইজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। ইহা ছাড়া, যামিনীর আরও কাজ আছে; যামিনী স্বয়ং উত্তম মেঠাই, নানাবিধ পক্কান্ন ও ছানার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। তাহাও পাড়ার মেয়েরা কিনিয়া খায়। তাঁহার পরিচিত ভদ্র-মহিলারা মেঠাই-সন্দেশ প্রভৃতি আর বাজার হইতে আনান না। দেবদাসী এসম্বন্ধে যামিনীর অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন।

কলিকাতার মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য ও বাবু। তাঁহারা ক্ষীরের দ্রব্য-নারিকেল-রচিত ফুল-ফল-চিড়া প্রভৃতি নানা সুদৃশ্য ও সুখাদ্য দ্রব্য, প্রস্তুত করিতে জানেন না; সুতরাং তাহাও যামিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন। আয় দেখিয়া তাঁহার বিলক্ষণ ভরসা

হইয়াছে যে, এভাবে বলিলে, খরচ কুলাইয়া হাতেও কিছু টাকা সঞ্চিত হইতে পারে।

যামিনী রামকৃষ্ণকে বড় ভালবাসেন। এখন আবার সেই ভালবাসার সঙ্গে একটু দয়াও মিশিয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের আস্ফালন-দম্ভ, ছোটমুখে বড়কথা, ছোট পদে লম্বা চাল, তাঁহার ভাগে না। যামিনীর আর একটা কথা এখন মনে হয়, উভয়ের শিক্ষাই সমান; তবে রামকৃষ্ণের এত পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন—সহিবেনই বা কেন? আর, সেই রামকৃষ্ণ তাঁহাকে ভরণ পোষণ করিবে, এ কথাটায়ও তাঁহার কষ্টবোধ হয় ও ঘৃণা হয়। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা, রামকৃষ্ণ ভাল হউক—বড় হউক; তথাপি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। তবে এ ভালবাসার ধার নাই—আবর্ত্ত নাই—স্রোত নাই। এ ভালবাসা ছেলেবেলা হইতে অভ্যস্ত; যামিনী ভালবাসেন বলিয়া যে রামকৃষ্ণ তাহার স্বামী হইতে পারিবেন, এ কথা যামিনী মনেও কখন স্থান দেন নাই। এইজন্যই যামিনী যখন রামকৃষ্ণের সহিত কথা কহেন, তখন মনে করেন, হয় তিনি পুরুষ, নয় রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক। এইজন্যই রামকৃষ্ণও এখনও নিজের মুখে তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিতে সাহস করেন নাই; গুণে মোহিত করিয়া যামিনীকে বিবাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।



নবম অধ্যায়।

এদিকে দেখিতে দেখিতে আর এক মাস চলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ সংবাদপত্র বাহির করিয়া হাতের টাকা ফুরাইয়াছেন; তথাপি সে পত্রের একজনও গ্রাহক হইল না বা কোন পত্র তাঁহার সুখ্যাতি করিল না। কাগজ তিন সপ্তাহ পরে অচল হইল।

নাটক-সম্বন্ধেও ঐরূপ ফল ফলিত হইল। নাট্যশালার কোন অধ্যক্ষই তাহা অভিনয় জন্য গ্রহণ করিল না। ইহাতে রামকৃষ্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। রামকৃষ্ণের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন লোক কলিকাতায় আরও অনেক আছে। সংবাদপত্র-উপলক্ষে এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের নিকট অনেকবার গমন করায়, রামকৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় আরও অনেক নিরাশ কবি-বন্ধু পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেই কবিবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন,—"ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি। তাই বলি, এস, একত্র মিলিত হইয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের মূর্খ ও অহঙ্কারী সম্পাদকগণের দর্পচূর্ণ করা যাউক। আমাদের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইলে, অসাধ্যও সাধন করা যাইতে পারে। আমি শুনিয়াছি, 'জনসনীয়ান'-দলের একটী সাহিত্য-সভা ছিল। সেই সভা, পণ্ডিতকে মূর্খ ও মূর্খকে পণ্ডিত বলিলেও গ্রাহ্য হইত। সকল শ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকার সেই সভার সদস্যগণের নিকট হাতযোড় করিয়া থাকিতেন। এস ভ্রাতৃগণ, আমরাও ঐরূপ এক সাহিত্য সমালোচনী সভা করি।"

এ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। রামকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পাদক নিযুক্ত

হইলেন; আর "মরাল" নামে এক জন নূতন কবি, সকলের অপরিচিত হইলেও, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

আগামী পরশ্ব সভার প্রথম অধিবেশন হইবে। সুতরাং সকলেই উৎসাহ-সহকারে সভার কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। কে কে নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিবেন, কে কে একটী বড় হলের চেষ্টা দেখিবেন, কে কে আস্বাব আদি ভাড়া করিয়া আনিবেন, কে কে আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিবেন, এবং কে কে বক্তৃতা প্রদান করিবেন, সকলই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং সকলেই গৃহের দিকে চলিলেন। রামকৃষ্ণও প্রায় দশদিন পরে, আজ রজনী নয় ঘটিকার সময়, বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী বাতি জ্বালিয়া শিল্পকার্য্য করিতেছিলেন; আর দেবদাসী বসিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণ হাস্যমুখে "মা কোথা" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেবদাসী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া, খাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। যামিনী আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। দেবদাসী অন্তর্হিত হইলে, রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"যামিনী, আমার উপর রাগ করিয়াছ। রাগ করিতে পার, আমি তোমার চিত্তবিনোদন করিতে পরিতেছি না। কিন্তু ভাই জান না, আমি কেমন এক মহৎ কাজে ব্রতী হইয়াছি—কিছু দিন অপেক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে, আমি তোমার অযোগ্য দাস নহি।"

যামিনী কিছু বলিলেন না, মাথা তুলিয়া একটু হাসিলেন, আবার কাজ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—"একি, বিবাহের সাড়ী প্রস্তুত হইতেছে নাকি! বটে?"

যামিনী গম্ভীর-বদনে বলিলেন,—"রাম, তুমি জান না—তুমি

কে, আর আমি কে ? আমার শোক নির্ব্বাণ হইবার আরও গৌণ আছে ; নির্ব্বাণ হইল, তখন আমোদ করিও।”

রামকৃষ্ণ দেখিলেন, যামিনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—“যামিনী, মাপ কর—প্রসন্ন হও, বিরক্ত করিব না। কিন্তু যামিনী, একবার মনে করিয়া দেখ, আমি কার জন্য, সন্ন্যাসী না হইয়া, সম্মান যশ ও অর্থলাভের উন্নত-শিখরে আরোহণ করিতেছি।”

যামিনী এবারে হাসিলেন—শিল্প পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ-প্রস্ফুটিত-নয়নে রামকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন ; এবং কিছু পরে বলিলেন,—“বেশ বলিয়াছ ! যেদিন যশ ও অর্থের উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে, সেইদিন তোমাকে উপপতি করিব। কেমন—সন্তুষ্ট হইলে ?”

“উপপতি—সে কি !”

“তবে কি বলিব !”

“পতি।”

“আমি যে বিবাহিতা !”

“তুমি বিধবা।”

“পরলোক, পাপপুণ্য বিশ্বাস কর ?”

“করি।”

“তবে স্বীকার কর, আমি সধবা।”

“কিরূপ ?”

“আমার স্বামী পরলোকগত—পরলোকে তিনি আমাকে [illegible]যেন—তাই আমি সধবা।”

“এ হিন্দুর কথা, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মের কথা নহে।”

"আমরা ত হিন্দু।"

"ব্রাহ্ম বা খৃষ্টানের মতে বিবাহ করিব।"

"পরলোকে যদি বিচার হয়, তুমি ও পূর্ব্ব-স্বামী উভয়েই যদি আমাকে দাওয়া কর, তবে কে আমায় পাইবে?"

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"তুমি পত্নী ঘরে রাখিয়া দূর-দেশে গিয়াছ, আর একজন তাহাকে অধিকার করিল; তুমি আসিয়া বিবাদ করিলে, পরে উভয়ে নালিশ করিলে; পত্নী কে পাইবে?"

"আমি পাইব।"

"তবে ত পরকালে তুমি হারিবে, আমার স্বামী জিতিবেন?"

রামকৃষ্ণ নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"আচ্ছা, উপপতি হইব।"

যামিনী হাসিয়া কহিলেন,—"পরকালের বিচারের ভয়ে যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে না পারি?"

"আমি আত্মহত্যা করিব।"

এই বলিয়া রামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন

যামিনী 'হা-হা' করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"আত্মহত্যা বড় বীরত্বের কাজ, তুমি পারিবে না।"

এমন সময়, দেবদাসী খাবার আনিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন,

বাঃ ভাই বেশ লেখেছ।—

দশম অধ্যায়।

আজ রামকৃষ্ণের বড় সুখের দিন, আজ তাঁহার সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবে। বড় বড় লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবে, সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইবে। তাই নয়টার সময় আহার করিয়া, চাপকান-চোগা গায় দিয়া, মাথায় ঠাকুর-পাগড়ী পরিয়া, রাম বাবু 'তাসের গ্রেট মোগলের' ন্যায় চলিলেন।

কলুটোলার কোন ভগ্নপ্রাসাদ, সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্যোগী মহাপুরুষদের চাঁদার টাকায় আসবাবাদি ভাড়া করা হইয়াছে। সুসজ্জিত সদস্য ও দর্শক-প্রধান স্কুলের ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত হইয়াছে। কেবল রামকৃষ্ণের অপেক্ষায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। সভায় যে সকল মান্যগণ্য বক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আপিসের বড়বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য,—মূর্খ বড়বাবুটা দেখিয়া যাউক, রামকৃষ্ণ কি দরের লোক! বলা বাহুল্য, বড়-বাবুও অন্যান্য মান্য গণ্য ব্যক্তির ন্যায় অনুপস্থিত। স্কুলের মহামান্য ছাত্রবৃন্দ সভার কার্য্যে গৌণ দেখিয়া, শৃগাল-গর্দ্দভ প্রভৃতি সুসভ্য জন্তুর সুস্বর-লহরী তুলিয়া সভাগৃহের গৌরব রক্ষা করিতেছে। এমন সময়, রামকৃষ্ণ বাবুর "অমনি-বস" দুই পক্ষীরাজ টানিতে টানিতে আনিয়া, গেটে থামিল।

রামকৃষ্ণ হাস্যবদনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যেমন সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, অমনি তাঁহার পরিচিত একজন চাপরাশী মাথা নত করিয়া বলিল,—"বাবু সাহাব সেলাম।" প্রতিসেলাম দিবার

পূর্ব্বেই, একজন পুলিসের লোক ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

হায়—হায়! এ কি হইল? দলপতি ধৃত হইলেন। সাহসী সভ্যগণ ও দর্শকগণ মনে করিলেন, না-জানি সভার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য মনে করিয়া, পুলিসের লোক দলপতিকে ধরিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা, প্রাণপণে, কেহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেহ নর্দ্দামা দিয়া, কেহ পশ্চাতের জীর্ণ দ্বার ভাঙ্গিয়া, পলায়ন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ও পুলিসের লোক বিস্মিত হইলেন। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার নামে কি জন্য ওয়ারেণ্ট জারী হইয়াছে?" পুলিসের লোক উত্তর দিল,—"তহবিল তছ্‌রুপ!" রামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দোষী; সুতরাং মনে করিলেন, এ বড়বাবুর কার্য্য।

রামকৃষ্ণের আপিসের হিসাব-বহিতে এক হাজার টাকা এক ব্যক্তির নামে বেশী লেখা। অথচ হিসাব-বহির মোট টাকার সহিত খাতাঞ্চির তহবিলের বেশ মিল আছে। এক ব্যক্তি ৫০০০৲ টাকা পাইবে, তন্মধ্যে ৪০০০৲ টাকা পাইয়াছে; সে আজ চারি মাস পরে অবশিষ্ট হাজার টাকা লইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার নামের ঘরে লেখা পাঁচ হাজার; কিন্তু সংলগ্ন রসিদে চারি হাজার লেখা। বাকি হাজার টাকা কি হইল?

রামকৃষ্ণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া জামিনে খালাস পাইলেন। ছয় দিন পরে বিচার হইবে। রামকৃষ্ণ খালাস পাইয়া, আপিসে যাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বড়বাবুকে কহিলেন,—"মহাশয়, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী; আমি এ টাকার কিছুই জানি না।"

বড়বাবু খাতা দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দেখ! আমার বিশ্বাস, তুমি যথার্থই নির্দ্দোষী; কিন্তু আমি কি করিব? সাহেব তোমাকে পুলিসে দিয়াছেন। হইতে পারে, তুমি ভ্রমে ও অন্য মনস্ক-হেতু একের টাকা অপরের নামে লিখিয়াছ। পূর্ব্ব খাতাঞ্জীর মৃত্যু না হইলে, এরূপ গোল সহজে ধরা পড়িত। তুমি তাঁহার অনুপস্থিতিতে কয়দিন কাজ করিয়াছিলে, তাহাতেই এরূপ হইয়াছে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি মনোযোগ-পূর্ব্বক খাতা দেখিয়া এ গোল বাহির করিতে পারিব।" বড়বাবু তাহাকে দেখিবার আদেশ দিলেন।

রামকৃষ্ণ রোজ আপিসে আসিয়া তন্নতন্ন করিয়া খাতা দেখেন; কিন্তু টাকার ভুল কিছুতেই বাহির করিতে পারেন না। অবশেষে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। জেলে যাওয়ার জন্য তিনি তত বিষণ্ণ নহেন, যামিনী এ কথা শুনিবে বলিয়াই তিনি অধিকতর বিষণ্ণ। এইজন্যই আর বাড়ী যান নাই।

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিচারের দিন আসিল; বিচার হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণের পয়সা নাই, সুতরাং ভাল উকিল দিতে পারিলেন না। তথাপি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া ও খাতা-পত্রের অবস্থা দেখিয়া, বিচারকের বিশ্বাস হইল—"ভ্রমে একের টাকা অপরের নামে লেখা হইয়া থাকিবে; তাহা না হইলে ৫০০০৲ টাকা লেখা, অথচ তৎসংলগ্ন রসিদে ৪০০০৲ টাকা কেন থাকিবে? যথার্থ মন্দলোক অবশ্য রসিদের টাকার অঙ্ক জাল করিয়া তৎস্থানে ৫০০০৲ টাকা লিখিবারই চেষ্টা করিত।"

বিচারকের বিশ্বাস হইলে কি হয়—তিনি আইনে বাধ্য!

তথাপি এদিক-ওদিক করিয়া তিনি বিচার-কার্য্যে গৌণ করিতে লাগিলেন।

*   *   *

কথা গোপন থাকে না; দৈনিক পুলিশ-রিপোর্টে উহা প্রচার হয়। যে বাটীর মেয়েরা যামিনীকে বড় ভালবাসে, সেই বাটীতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আসিয়া থাকে; যামিনী তাহা চাহিয়া আনিয়া পড়েন। সুতরাং রামকৃষ্ণের এই সাঙ্ঘাতিক সংবাদ পাইয়া, তাঁহার কোমল হৃদয়ে দয়া হইল; তিনি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া, মাকে সঙ্গে লইয়া আপিসে চলিলেন।

আপিসের নিকট উপস্থিত হইয়া, বড়বাবুকে খবর পাঠাইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বড়বাবু নাই; তাঁহার অসুখ হইয়াছে। যামিনী তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া সাহেবের নিকট খবর পাঠাইলেন; সাহেব উপরে যাইতে বলিলেন। যামিনী উপরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, সাহেব ও বিবি বসিয়া আছেন—অন্য লোক নাই বিবিকে দেখিয়া, তাঁহার ভরসা হইল; তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ বাবুকে মাপ করিতে হইবে!"

সাহেব ও মেম বিস্মিত হইলেন। কিন্তু যামিনীর নিষ্কলঙ্ক ও সাহসপূর্ণ সুন্দর বদন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন।

মেম বলিলেন,—"তুমি তার কে?"

যামিনী নিজ দুঃখ বর্ণন করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সাহেব ও বিবি উভয়েরই করুণার সঞ্চার হইল। বিবি তাঁহার হাত ধরিয়া একখানি আসনে বসাইলেন। সাহেব কহিলেন,—"আমি কি করিব? এখন ম্যাজিষ্টেট তাহাকে ছাড়িবেন না।"

৩

যামিনী বলিলেন,—"তবে আমাকে দয়া করিয়া সেই খাতা-খানি দেখিতে দেন!"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"খাতার হিসাব-পত্র বুঝিতে পারিবে?"

যামিনী সাহস করিয়া কহিলেন,—"পারিব।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই কয়খানা খাতা আসিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"কি, এত খাতা দেখিতে পারিবে?"

যামিনী বলিলেন,—"যদি সঙ্গে নিতে দেন, তবে সমস্ত রাত জাগিয়া দেখিতে পারি।"

সাহেব কি জবাব দিবেন, তাই ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিবি হাসিয়া বলিলেন,—"লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া দেখ; আমিও সঙ্গে সঙ্গে দেখিব।"

যামিনী স্বীকৃতা হইয়া, খাতা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মা গাড়ী লইয়া বাড়ী গমন করিলেন।



একাদশ অধ্যায়।

অরুণোদয় হইয়া গৃহে কোমল রশ্মি পড়িয়াছে। গৃহকোণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেনারি-পাখি শিস্ দিতেছে। টেবিলে এখনও ল্যাম্প জ্বলিতেছে। যামিনী বাহ্য-জগতের কিছুই জানেন না; যেভাবে হিসাব দেখিতেছিলেন, সেইভাবেই দেখিতেছেন। জাগরণে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ স্ফীত হইয়াছে, ঢুলুঢুলু করিতেছে; মুখ মলিন এবং শুষ্ক।

বিবি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"ক্ষান্ত হও, অসুখ হইবে।" যামিনী মুখ তুলিলেন। সে মুখ শুষ্ক, চিন্তিত ও বিবর্ণ দেখিয়া, বিবির মনে দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন,—"আর কতটা বাকি ?"

যামিনী বলিলেন,—"একবার সমস্ত দেখিয়াছি—আবার ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখিতেছি, জেল অনিবার্য্য।"

বিবি হাসিয়া বলিলেন,—"অনাহার, জাগরণ, বাড়ী যাও—ভয় নাই, এক হাজার টাকা আমি দিয়া খালাস করিয়া দিব।"

বিবির এত দয়া দেখিয়া, যামিনী বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন—বিবি সে মুখমণ্ডলে অভিমান ও দুঃখ পাঠ করিয়া শিহরিলেন।

যামিনী বলিলেন,—"যদি যথার্থই এক ব্যক্তি চোর হয়, তবে অসৎপাত্রে আপনার টাকা যাইবে কেন ?"

"টাকা তোমার জন্য—তার জন্য নহে।"

"আমি টাকার জন্য আসি নাই।"

"তবে কেন আসিয়াছ ?"

"নির্দ্দোষী কি না, তাহাই বুঝিতে।"

"এখনও কি তাহা বুঝিবার বাকি আছে ?"

"একটু আছে

"কি ?

" তাঁর লিখিবার ডেস্কে কি আছে, দেখিব।"

বিবি হাসিয়া বলিলেন,—" আচ্ছা চল, তবে কেরাণীখানায় যাই।"

উভয়ে কেরাণীখানায় চলিলেন। কিন্তু এখনও আপিস খোলে নাই। চাবির অভাবে, বিবি হুকুম দিয়া রামকৃষ্ণের ডেস্ক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যামিনী সাবধানে উহার ভিতরের কাগজ-পত্র ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য কাগজখানিও দেখিতে ত্রুটি করিলেন না। এক টুকরা কাগজে লাল-কালির অক্ষরে কবিতা লেখা। ঐ কাগজখানি দেখা হয় নাই, কাগজপত্র বাহির করিতে ডেস্কের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। যামিনী যখন সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া অবশেষে নিরাশ-লোচনে বিবির মুখপানে চাহিলেন, তখন বিবি সেই কাগজখানি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"ওখানি কি কাগজ ?"

যামিনী কাগজ তুলিয়া তাহার অপর পৃষ্ঠা দেখিলেন—মনে আশা হইল, সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। বলিলেন,—"এ খানি হাজার টাকার রসিদ। হয় ত এই ব্যক্তির টাকা তাহার নামে জমা না হইয়া, অন্যব্যক্তির নামে জমা করা হইয়া থাকিবে।"

বিবি তখনই রসিদখানি লইয়া উপরে চলিলেন। খাতা খুলিয়া নাম বাহির করিলেন। যথার্থই সে নামে টাকা জমা নাই, রসিদও তাহার পাশে সংলগ্ন নাই। অল্পক্ষণ মধ্যে ইহা সাহেবের কর্ণে গেল। সাহেব দেখিলেন—রসিদদাতা কলি-কাতার লোক। তখনই টেলিগ্রাফ্ করিলেন। টেলিগ্রাফের উত্তর আসিল,—"হাজার টাকা পাইয়াছি।"

সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"রামকৃষ্ণ নির্দ্দোষী।" শুনিয়া, যামিনী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিবি তাঁর চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন,—"যামিনী, তোমার পরিশ্রম সার্থক। তোমার প্রাণ উচ্চ। বল, আমরা তোমার কি করিতে পারি?"

যামিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"রামকৃষ্ণের অসাবধানতা-দোষ দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। তাহাকে একটি চাকরি দিবেন, তবেই সন্তুষ্ট হইব।"

সাহেব ও ঝিবি উভয়েই তাঁহার পানে বিস্ময়ের লোচনে চাহিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ মুক্তি পাইয়াছেন—মুক্তির বিবরণও শুনিয়াছেন। শুনিয়া, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁর চেয়ে যামিনী কত উচ্চ! তাঁহার মস্তক শীতল হইল, হৃদয় ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইল; মনে মনে বলিলেন, —"দেবী! আমি তোমার দাসের যোগ্য; আমি স্বামীর যোগ্য নহি।"

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আপিস-পূর্ণ লোক—তন্মধ্যে উচ্চাসনে বড়বাবু বসিয়া আছেন। এমন সময় সাহেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি; আসিলে, তাহাকে পূর্ব্ব-কাজ সাবধানে করিতে বলিবে।"

বড়বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে একপ্রকার আপনি কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন,—"তাকে বুঝাইয়া বলিবে, সে যেন কাজ হ[illegible]
ন ভবিষ্যতে তাহার ভাল হইবে

সাহেব স্বস্থানে গমন করিলে, কিছু পরে রামকৃষ্ণ বড়বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমাকে সাহেব কেন ডাকিয়াছেন?"

"পূর্ব্ব কাজ করিতে।"

"আর কাজ করিব না।"

"তবে কি করিবে?"

"তা কি জানেন না?"

"জানি, কিন্তু তুমি তাহা পারিবে না।"

"কেন মহাশয়?"

"কবিজনোচিত প্রতিভা বা ক্ষমতা তোমার নাই।"

"আপনি কিসে বুঝিলেন?"

"তুমি পাগল।"

"আপনি তবে বিখ্যাত কবি 'মরাল'কেও পাগল বলিবেন।"

"কোন্ 'মরাল'? তোমাদের মনোনীত সভাপতি!"

"হাঁ।"

"তাহাকে দেখিয়াছ?"

"না।"

"তাঁহাকে জান?"

"না।"

"তবে কিরূপে তাঁহাকে পাইবে?"

"খুঁজিয়া লইব।"

"মরাল কিরূপ কবি?"

"চমৎকার!"

"মরাল যদি কেরাণীগিরি করে, তবে তুমি তাহা করিতে অ-ন বোধ করিবে না ত?"

"এত বড় কবি কেরাণী হইতে পারে না।"

"যদি তাই হয়!"

"আমি তাঁহার অধস্থ কেরাণীরও পদসেবা করিব।"

"ঠিক ত?"

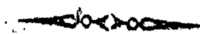
"ঠিক মহাশয়।"

"আমিই 'মরাল' স্বাক্ষর করিয়া কবিতা লিখিয়া থাকি।"

রামকৃষ্ণ শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজের ব্যবহারে লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইল; মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—"আশ্চর্য্য!"

বড়বাবু বলিলেন,—"কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এদেশের লেখকদের লেখায় পয়সা হয় না। দেখ, হেমবাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি কি করিতেছেন? তবে যাঁহাদিগের লিপি-ক্ষমতা এতাধিক যে, ইচ্ছা না থাকিলে একবার তোমাকে তাঁহাদের বহি পড়িতেই হইবে, না পড়িলে উপায় নাই, না পড়িলে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহারাই কেবল লেখনী লইয়া অহঙ্কার ও লেখনীর উপর সংসার-নির্ভর করিতে পারেন। উহা তোমার বা আমার কর্ম্ম নহে। এখন হইতে সাবধানে কর্ম্ম কর; এ পথে অর্থ ও উন্নতি সহজে হইবে।"

রামকৃষ্ণের মন ফিরিল। রামকৃষ্ণ আর এক রামকৃষ্ণ হইয়া কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে বড়বাবু পদান্তরে উন্নীত হইলে, রামকৃষ্ণ মোটাবেতনে বড়বাবু হইলেন।



উপসংহার ।

রামকৃষ্ণের খুব জাঁকাল অবস্থা দেখিয়া, দেবদাসী একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আর কেন ? বিবাহটা এখন হ'য়ে যাক।"

রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বদন প্রসন্ন হইল—ভাবিলেন,—"যামিনী আমার না হউক, অন্ততঃ এখন আমার অবস্থার দাসী হইতে সম্মতা হইবে।"

যামিনী সেই সময় বদন গম্ভীর করিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"মা, একটু অপেক্ষা কর। রামকৃষ্ণ, তুমিও একটু অপেক্ষা কর।"

রামকৃষ্ণের বদন আরও উজ্জ্বল, আরও প্রফুল্ল হইল।

সহসা যামিনীর শয়ন-কক্ষ হইতে এক সন্ন্যাসিনী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"মা, দেখ! রামকৃষ্ণ, দেখ! আমার বিবাহের পরিচ্ছদ কেমন হইয়াছে—।"

দেবদাসী নির্ব্বাক, রামকৃষ্ণ বিস্মিত।

দেবদাসী বলিলেন,—"এ বেশ কেন?"

যামিনী বলিলেন,—"যামিনী দেবী, চিরদিনই দেবী থাকিবে—দাসী হইবে না।"

দেবদাসী বলিলেন,—"তবে কি করিবে?"

যামিনী বলিলেন,—"চল, বৃন্দাবনে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, ব্রজের ধুলি গায়ে মাখিব।"

লীলা।

প্রথম অধ্যায়।

রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সুপণ্ডিত। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র হরদয়াল কলেজে পড়েন। কন্যা লীলা, সে বালিকা।

রামদয়ালের বড় সাধ, পুত্রটীকে মনের মত সুশিক্ষা দেন। কিন্তু বিধাতা ক'জনকে মনের সাধ পূর্ণ করিতে দেন? হরদয়াল পৃথিবীর মায়া—পিতার মায়া পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্রশোকে রামদয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। রামদয়ালের আর পুত্র হইবার আশা রহিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"লীলাকে সরস্বতী করিব।"

রামদয়ালের যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র পরিবার বেস্ সম্ভ্রমে থাকিতে পারে। সুতরাং তিনি চাকরী ও বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে আসিলেন। লোকে তাঁহার শোকে শোক মিশাইয়া, হরদয়ালের অভাব-যাতনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিল; তিনি লীলাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন,—"লীলা আমার শত হরদয়াল।"

বাড়ী আসিয়া রামদয়াল এক নূতন চাকরী লইলেন। চাকরী অবৈতনিক, কিন্তু রামদয়াল শিমলা-শিখরে বসিয়া বিশ হাজার

টাকা পাওয়ার চেয়েও তাহা অতি বেশী সুখের বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি লীলার শিক্ষক হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ... শিক্ষক হইলে নারীর উচ্চশিক্ষার ফল যৌবন-স্রোতে বিষের সাগরে ভাসিয়া যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামদয়াল লীলাকে অতি সাবধানে লেখা-পড়া শিখাইতে লাগিলেন। লীলা শিক্ষার একপদ অগ্রসর হইলেই তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, উহাকে সরস্বতী করিতে পারিবেন।

লীলার বয়স যখন নয় বৎসর হইল, তখনই লীলা রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া পিতাকে শুনাইত, এবং ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ, সীতার বনবাস, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ... প্রভৃতি বাঙ্গলা-গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া পড়িতে পারিত। আর অতি পরিষ্কার অক্ষরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিত।

রামদয়াল দেখিলেন, কন্যার বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ জ্ঞান সুন্দর জন্মিয়াছে। সুতরাং এখন আর উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া, একযোগে সংস্কৃত ও ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। লীলা, খেলার আনন্দে তাহা শিখিতে লাগিল।

তের বৎসর বয়সের সময় লীলা একদিন পিতার শিয়রে বসিয়া পড়িতেছে। একখানি পুঁথি বামহস্তে ধরিয়া ক্রোড়ে

রাখিয়াছে, আর একখানি ডানহাতে ধরিয়া মৃদুস্বরে পড়িতেছে। এই সময়ে রামদয়ালের একজন প্রাচীন বন্ধু উপস্থিত হইয়া বসিলেন। লীলার কোমল মাধুরীতে তাঁহাকে বিস্মিত ও মোহিত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি ওখানি কি পড়িতেছ ?"

লীলা ধীরে ও সম্ভ্রমে কহিল,—"গীতা।"

বন্ধু অবাক হইয়া রামদয়ালের মুখপানে চাহিলেন! রামদয়াল হাসিয়া বলিলেন,—"গীতা উহার কণ্ঠাগ্রে—নিজে ব্যাখ্যা করিয়া ও বুঝিয়া পড়িতে পারে।"

বন্ধু পুনরায় লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বাঁ-হাতে ওখানি কি বই, মা!"

এবারে লাজশীলা লীলা একটু হাসিয়া বলিল,—"জন বুনিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস।"

বন্ধু নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ।

তৃতীয় অধ্যায়।

লীলার পনের বৎসর বয়স হইল। গ্রামের লোক ছি ছি করিতে লাগিল—আর এদিকেও কত সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

লীলা কুলীন কন্যা বটে; কিন্তু সেজন্য যে উহার বয়স বেশী হইয়াছে, তাহা নহে। রামদয়াল কন্যাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না। সুতরাং তিনিই দোষী।

লীলা পনের বৎসরের হইয়াছে এবং ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেস্ শিখিয়াছে বটে ; কিন্তু এখনও তাহার বালিকা-ভাব যায় নাই— এখনও পৃথিবীর দূষিত বায় তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে পায় নাই। লীলা কেবল বহি পড়িয়াছে, পীড়িতা মাতার সেবা করিয়াছে, এবং পিতার উজ্জ্বল বদন নিয়ত দেখিয়াছে। ইহা বৈ লীলা নুতন কিছু জানে না, নূতন কিছুই শিখে নাই।

একদিন রামদয়াল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লীলা, এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে। এখন আর রাখিতে পারি না, স্বামীগৃহে সকলের প্রিয় হইয়া থাকিতে গেলে অনেক কষ্ট সহিতে হইবে।"

লীলা দেখিল, পিতৃদেবের দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। স্নেহময়ী কি উত্তর দিবে? তবে অশ্রুপাতের প্রতিদান যদি অশ্রুপাত হইতে পারে, তবে লীলার নয়ন-নির্ঝর তাহার যথেষ্ট উত্তর।

লীলা কাঁদিল।

"মা! কাঁদিতেছ কেন?"

"তুমি কাঁদিলে কেন, বাবা?"

"তোমার বিবাহের কথায়।"

"বিবাহ!"

"হাঁ মা!"

"তবে বিবাহ কাজ কি?"

রামদয়াল হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"বিবাহে কাজ না থাকিলেও, বিবাহ করিতে হয়। নারীর স্বামী বই গতি নাই। স্বামী, পিতা-মাতা হইতে উচ্চ; স্বামী দেবতা। নারীর বিবাহের

অর্থ—নারীর দেবসেবায় রত হওয়া। এখন তোমার বয়স হইয়াছে—এখন কঠোর ব্রত ধারণ করিতে পারিবে, দেবসেবা করিতে সক্ষম হইবে—এখন তোমাকে গৃহে রাখিলে আমাদের পাপ হইবে।”

লীলা শুনিল, কিছু বলিল না। রামদয়াল পুনরায় বলিলেন,—“লীলা, তুমি সুশিক্ষিতা এবং তোমার ভালমন্দ বুঝিবার উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে। তুমি যদি লজ্জা না করিয়া আমার কথার সদুত্তর দাও, তবে আমাকে বড় খুসী করিবে।”

লীলা বলিল,—“কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।”

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন,—“সিন্ধুকে দেখিয়াছ ?”

“যিনি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন ?”

“হাঁ।”

“দেখিয়াছি।”

“তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে চাহ।”

লীলা ইহার কোন উত্তর দিল না ; ধীরে ধীরে পিতার নিকট হইতে উঠিয়া, মাতার শয্যাপ্রান্তে যাইয়া বসিল।

রামদয়াল লীলাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। লীলার ফুল্লবদন এবং নৃত্যশীল নয়নই তাঁহার প্রশ্নের পরিস্ফুট উত্তর দান করিল।

লীলার বিবাহ হইল। লীলা সুখী হইল। ভাবিল,—“নবজীবন পাইয়াছি—পতিসেবা নহে—যথার্থই দেবসেবা করিতে পাইয়াছি ; ইহার পরেই বুঝি স্বর্গ—সে স্বর্গ, কত দূরে, কত উচ্চে ?”

চাঁদে কলঙ্ক না থাকিলে, চন্দ্রমাধুরী পরিস্ফুট হইত না। কমলদলে কণ্টক না থাকিলে, কমলের গৌরব বাড়িত না।

সুখ দুঃখ-মিশ্রিত না থাকিলে, সুখ সুখের হইত না। তাই সহসা লীলা-চন্দ্রে কলঙ্কপাত হইল—লীলার সুখের হাসি না ফুরাইতেই দুঃখ আসিয়া তাহাকে ঘিরিল।

বিবাহের ছয় মাস পরে লীলার মা মরিল ; আর ছয় মাস পরে বাপ মরিল ; তাহার তিন মাস পরে স্বামী শয্যাগত—রোগে মৃতপ্রায়। ধর্ম্ম-বল, যোগ-বল, ঐশী-বল, কি সৌভাগ্য-বল, যে বলেই বল—লীলা বিধবা হইল না। লীলা, স্বামীকে কলিকাতা লইয়া গিয়া, বহু অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইল। স্বামী মৃতদেহে জীবন পাইল—কিন্তু তাঁহার পৌরুষ-শক্তি নষ্ট হইল।

লীলা রুক্মা নহে, লীলা আমেরিকা বা ইউরোপীয় ললনা নহে, লীলা নারীসমাজ-সংস্কারিণী বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিতাও মনে করে না ; সুতরাং স্বামীর পুরুষশক্তি ধ্বংসাবধংসের জন্য সে কিছুমাত্র বিষণ্ণ নহে। স্বামী মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়াছেন—এই তাহার আনন্দ, স্বামীপদসেবা তাহার সুখ। পতিসেবা—দেব-সেবা, ইহা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই তাহার শান্তি। যে কাজ, সে জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়াছে, তাহা তাহার বজায় রহিয়াছে ; সুতরাং সে আর কিছুই চাহে না।

লীলার জন্য লীলার স্বামী বিষণ্ণ ; লীলার রূপগুণমুগ্ধা পরিচিতা রমণীগণ বিষণ্ণ, কিন্তু লীলা বিষণ্ণ নহে। তাহার সুখ ও প্রফুল্লতা এখনও হৃদয়ে আটুপূর্ণ। তন্মধ্যে কেবল একটু চিন্তা, পাছে স্বামী মনে করেন, ইন্দ্রিয়-সেবনে অসমর্থ হইয়া সে কষ্ট পাইতেছে বা অসুখে আছে। শুদ্ধ এই ভয়ে বা ভাবনায়, লীলা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। লীলা অধিকতর স্বামীসেবাপ্রিয় এবং

অধিকতর আনন্দিতা ও সর্ব্বদা হাস্যমুখী, ইহা দেখিয়া তাহার স্বামীর আর বিস্ময়ের পার রহিল না।

এহেন স্ত্রীরত্ন তাঁহার সহবাসে বনকুসুমের ন্যায় বিশুষ্ক হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি অস্থির। লীলা কমল-করে যখন তাঁহার পদসেবা করে, তখন তিনি লীলার দুঃখে ক্রন্দন করেন; লীলা অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা করে।

একদিন পদসেবা তাঁহার অসহ্য হইল। ধীরে কোমল বন্ধন হইতে পদ মুক্ত করিয়া, বলিলেন,—কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন,—"লীলা, সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় তোমার কে?"

লীলা হাসিয়া বলিল,—"আমার কে? আমার স্বামী—আমার দেবতা।"

এবারে, সিন্ধু কাঁদিয়া বলিলেন,—"তোমার সিন্ধু মরিয়াছে, সে ক্লীব। ধর্ম্মমতে তুমি পুনরায় বিবাহ করিতে পার। তাহা করিতে হইবে।"

লীলা তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া বলিল,—"কি অপরাধে দাসীকে এ নিষ্ঠুর কথা কহিতেছ? তোমার একটী পিস্তল আছে; যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি, তাহা দিয়া আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা শুনাইয়া কষ্ট দিও না।"

সিন্ধু নীরবে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।



চতুর্থ অধ্যায়।

সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় যুবাপুরুষ, সুন্দর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সংসারে পিতা-মাতা, ভাইভগিনী কেহই নাই; স্বয়ং বিপুল পৈত্রিক বিষয়ের একমাত্র অধিকারী। তাঁহার পীড়া না হইলে, লীলার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা ও পরমাসুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি পৃথিবীর সম্রাটকেও একদিন তুচ্ছ করিতে পারিতেন। কিন্তু কি বিষম বিড়ম্বনা!

সিন্ধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—কলিকাতা থাকিবেন, যে কোন উপায়ে হয়, লীলাকে বিবাহ দিয়া সুখী করিবেন। ইহা করিতে যাইয়া, সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়—জাতিকুল হারাইতে হয়, তাহাতেও স্বীকার। তিনি ভাবিলেন, নামে-মাত্র বিবাহ করিয়া এহেন সুন্দরী লীলার চিরসুখের কণ্টক হইয়া থাকিবেন না।

সিন্ধু, বিবাহে রাজি করিবার জন্য, লীলাকে কত অনুনয়-বিনয়, কত প্ররোচনা, কত অনুরোধ, কত উপদেশ, কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু লীলার হৃদয় অটল। এরূপ অটলতা দেখিয়া, তিনি মনে করিলেন,—তাঁহার সাক্ষাতে লজ্জা-বশতঃই লীলা বিবাহে এরূপ অস্বীকৃত হইতেছে; সুতরাং আর মুখে কিছু না বলিয়া কৌশল অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

প্রথম কৌশল—সিন্ধু তাঁহার তিনটী অবিবাহিত বন্ধুকে লীলার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। ইহার একজন ব্রাহ্ম, দুইজন খৃষ্টান—তিনজনই সুশিক্ষিত, সুন্দর ও যুবক। সিন্ধু নিজ উদ্দেশ্যও

তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। এরূপ সুবিধা কোন্ রসিক-যুবা অবহেলা করিতে পারে? সুতরাং তাহারা প্রতিনিয়ত লীলার সহিত কথোপকথন করিতে আসিতে লাগিল। কিন্তু লীলা, স্বামীর অনুরোধ উপেক্ষা করা পাপ মনে করিয়া, অতি কষ্টে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। অবশেষ সিন্ধুর বন্ধুদ্বয় ক্লান্ত হইয়া হারি মানিলেন। একে একে সকলেই সিন্ধুকে বলিলেন,—"লীলা সাধারণ নারী নহে—দেবী। ছলে বলে বা কৌশলে কিছুতেই তাহার চিত্তাকর্ষণ করা সাধ্যায়ত্ব নহে।"

কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া, সিন্ধু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন,—অন্যে বিবাহ করিলে তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া হয় ত লীলা বিবাহে স্বীকৃতা নহে। সুতরাং উকিল-বাড়ী যাইয়া লীলার নামে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং যথারীতি রেজেষ্টরি করিয়া আনিয়া লীলার হাতে দিলেন।

একমাস পরে লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দানপত্রখানি যত্নে রাখিয়াছ?"

"দানপত্র কি?"

"আমার সমস্ত বিষয় যে তোমার হইয়াছে, সেই দলিলই?"

লীলা হাসিয়া বলিল,—"তোমার হইলেই আমার হইল; তার আবার দলিল কি?"

সিন্ধু বলিলেন,—"একমাস হইল, তোমাকে একখানি কাগজ দিয়াছি; তা কি তুমি পড় নাই?"

"না!"

"পড় নাই?"

"না—তুমি ত পড়িতে বল নাই ?"

"তবে কি করিয়াছ ?"

"বাক্সে রাখিয়াছি।"

সিন্ধু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন,—"দলিলখানি লইয়া আইস।"

লীলা, তিলমাত্র গৌণ না করিয়া, দলিল আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। সিন্ধু বিষয়গুলি পাঠ করিলেন।

লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল,—"আমার নামে কেন ?"

সিন্ধু বলিলেন,—"এখন হইতে সকল বিষয়ই তোমার হইল ; যাহা খুসী করিতে পারিবে, আমার কিছুতেই অধিকার থাকিল না।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল;—কেন ?"

সিন্ধু বলিলেন,—"প্রশ্ন করিও না, এখানি রাখিয়া দাও।" লীলা আদেশ-মত উহা গ্রহণ করিল।

সিন্ধু এবারে খুলিয়া বলিলেন,—"লীলা, আমার জন্য কেন কষ্ট পাইবে, বিবাহ করিয়া সুখী হও। এখন আমার সকল ঐশ্বর্য্যই তোমার—লোভে অতি রূপবান ও গুণবান পুরুষ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে এবং বিবাহ করিলে কোন কষ্টই পাইবে না। কলিকাতা, কাশী বা বৃন্দাবন, যেখানে খুসী, রাজরাজেশ্বরী হইয়া থাকিতে পারিবে। আর—"

সিন্ধুর বাক্য শেষ না হইতেই, লীলা মূর্চ্ছিতা হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইল। তিনি শুশ্রূষা করিয়া তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলে, সে কাঁদিয়া তাঁহার পা ধরিয়া বলিল,—"এরূপ নিষ্ঠুর কথা আর বলিও না, তাহ'লে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না।"

. . সিন্ধু কিছুকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন,—' লীলা, যদি বিবাহের কথায় এত কষ্ট পাও, আর বলিব না ; এই দলিলখানি সম্প্রতি তোমার কাছে রাখিয়া দাও।"

লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া বলিল,— "আর আমায় কাঁদাইও না।"

পঞ্চম অধ্যায়।

লীলার অটলতা দেখিয়া, সিন্ধুর মনে কেমন একপ্রকার ভয় জন্মিল। তিনি একেবারে হতাশ হইয়া চিন্তায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন ; ভাবিলেন,—"বুঝি আমি মরিলে লীলা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।" সুতরাং এখন তাঁহার চিন্তা এবং চেষ্টা হইল—কিরূপে সহজে মরিতে পারা যায়। উদ্বন্ধনে বা তীব্র বিষপানে মরিলে, লীলা বিপদগ্রস্ত হইবে ; তিনি পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন—সাধারণে নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এখন আর লীলার শুশ্রূষা—লীলার রূপ—লীলার হাসিমুখ—লীলার ভালবাসা—তাঁহার ভাল লাগে না। এখন লীলা তাঁহাকে শত্রু মনে করিলে, অথবা সহজে তিনি মরিতে পারিলেই, কেবল সুখী হইতে পারেন।

একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, ডাক্তার পলিডোরি কিরূপে ধীর-বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহারা প্রভুপত্নীর যোগে প্রভুকে বধ করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল. মনে শান্তি

হইল—একলম্ফে শয্যা হইতে উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বস্ত্র লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। যাইবার কালে লীলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা যাও?"

সিন্ধু অনেক দিন পরে আজ হাসিয়া বলিলেন,—"নিমন্ত্রণ হইতে।" স্বামীর বদনে হাসি দেখিয়া লীলার প্রাণ শীতল হইল।

রাত এগারটার সময় সিন্ধু গৃহে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। লীলাকে বলিলেন,—"বড় অসুখ হইয়াছে।"

লীলা সারারাত জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল। প্রাতে জিজ্ঞাসা করিল,—"ডাক্তার আনাইব?"

যে হতভাগ্য ডাক্তারকে টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন, সিন্ধু তাহাকেই আনিতে কহিলেন। ডাক্তার আনিতে বিলম্ব হইল না।

ডাক্তার যথারীতি রোগী দেখিয়া বলিয়া গেল,—"আমার ঔষধালয়ে লোক পাঠাইয়া ঔষধ আনাইও।"

ঔষধ আসিল। রোগী তাহা যথারীতি সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একদিন, দুইদিন করিয়া ক্রমে দশ দিন গত হইল; কিন্তু সিন্ধু ক্রমেই বেশী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লীলা দেখিল, ঔষধে তাঁহার স্বামীর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে—তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছেন।

লীলার আহার নাই, নিদ্রা নাই। দেখিলে বোধ হয়, এক রোগী আর এক রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। লীলা দশদিনের দিন সিন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এ চিকিৎসক ভাল নয়, আর একজনকে আনা যাক্।"

সিন্ধু অতি কষ্টে বলিলেন,—"আবশ্যক নাই।"

লীলা তাঁহার কথা না শুনিয়া চুপে চুপে সহরের প্রধান ডাক্তার-সাহেবকে আনিতে পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিন্ধুর অবস্থা আরও মন্দ হইল। এত মন্দ হইল যে, লীলা কাঁদিতে লাগিল। সিন্ধু লীলার মুখপানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—"লীলা, আমি যাই—স্বামী-বাক্য পালন ক'রো। আমি মরিলে বিবাহ করিবে, বল—প্রতিজ্ঞা কর।"

লীলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—"হৃদয়ে যদি সহমরণ যাইবার বল না থাকে—সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তোমার জীবন রক্ষা করিতে না পারি—প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

সিন্ধুর বদন প্রসন্ন হইল, সিন্ধুর নিদ্রা হইল।

একাদশ দিনে, পূর্ব্ব-চিকিৎসক-প্রেরিত ঔষধ সিন্ধুকে সেবন না করাইয়া, লীলা নূতন চিকিৎসকের অপেক্ষায় রহিলেন। সিন্ধু যখন ঔষধ চাহেন, লীলা তখন ঔষধ বলিয়া জলপান করিতে দেন।

এই সময়ে নূতন চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লীলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"আপনি যত টাকা চান, আপনি যাহা চান, আমার যাহা কিছু আছে, সকলই আপনাকে দিব; আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ভাল করিয়া দেন।"

চিকিৎসক, আশ্বাস দিয়া, রোগীর অবস্থা দেখিলেন। দেখিয়া, বলিলেন,—"এরূপ অজ্ঞান অবস্থা কতক্ষণ?"

"এইমাত্র।"

"পীড়া কত দিন হইয়াছে?"

"এগার দিন।"

"পূর্ব্ব-চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র দেখাও?"

"ব্যবস্থা-পত্র তিনি দেন না।"

"তবে ঔষধ পাঠান?'

"হাঁ।"

"নিজের ডিস্পেন্সারির?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"ঔষধের শিশি কোথা?"

লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে শিশি আনিয়া দিল। ডাক্তার শিশিস পত্র লিখিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য পাঠাইলেন। লোক, আর এক খানি চিঠি লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল; সাহেব তাহা পাঠ করি হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার স্বামী ভাল হইবেন, চিন্তা নাই। এই বলিয়া, ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন,—"এই ঔষধ সেব করাইবেন; আমি কাল আসিয়া দেখিব।"

যাইবার কালে লীলা পুনরায় সাহেবের পা ধরিয়া কাঁদি লাগিল। সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—"আ নিশ্চয় ভাল করিয়া দিব।"

* * *

লীলার শুশ্রূষাগুণে, এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসাগু একমাসের মধ্যে, সিন্ধু, শুদ্ধ আরোগ্য হইলেন না, সবল এবং সুস্থ

হইলেন। এ সবলতা—এ স্বাস্থ্য সিন্ধু অনেক দিন হারাইয়াছিলেন। বিধাতার কি অনন্তলীলা, বিষপান অমৃতপান হইল। এ লীলা—লীলার সতীত্বের পুরস্কার।

উপসংহার।

একদিন সিন্ধু প্রফুল্ল মনে নিজ-হাতে লীলাকে নূতন আভরণে সাজাইতেছেন। লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কনে ত সাজালে; এখন আমার বর কোথায়? বিবাহের কি করিলে?"

সিন্ধু তাঁহার গণ্ড নাসাগ্রে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"এই ত বিয়ের আয়োজন কচ্ছি।"

একটা শুকপাখী একপাশে ছিল; সেও বলিল,—"এই ত বিয়ের আয়োজন কচ্ছি।"

সিন্ধু ও লীলা হাসিয়া উঠিলেন।

লীলা আবার বলিল,—"এখন তোমার সকল বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইতে রাজি আছি; আবার জোরে দখল করিবে না ত?'

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"যদি তাহাই করি।"

লীলা বলিল,—"তাহা করিবার আগে আমার সকল বিষয় ছারখার করিয়া ফেলিব।"

"কিরূপে ছারখার করিবে?"

"দেখিবে?"

"দেখিব।

"তবে এই দেখ" বলিয়া, লীলা দৌড়িয়া একটা ছোট-বাক্স লইয়া আসিল ; এবং উহা হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেশালাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল।

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"পুরুষ হইয়া সতীন দেখিবার সাধ এতদিনে পুড়িয়া ছাই হইল।"

মাসিক উপন্যাস।] পৌষ, ১৩০০। [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

আমাদের ঝি।

(উপন্যাস।)



সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,

প্রকাশক,

'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়, ৮নং টেমার্স লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।

৯৪।১নং লোয়ার সারকুলার রোড, অন্নপূর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
শ্রীবেণীমাধব ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।

আমাদের ঝি।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! উপন্যাস নহে—সত্য ঘটনা। আশ্বিন মাস, সপ্তমী পূজার দিন আমি আমার শ্বশুর-বাড়ী চলিয়াছি। ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট কোন গণ্ডগ্রামে আমার শ্বশুর-বাড়ী। অনেক কষ্টে শিয়ালদহ-ষ্টেশন হইতে টিকিট কিনিয়া, আমি ডায়মণ্ডহারবারের গাড়ীতে উঠিলাম; তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এ বৎসর ঐ অঞ্চলে বড়ই দুর্ভিক্ষ—গাড়ীতে অনেক লোকের মুখেই কেবল ঐ দুর্ভিক্ষের কথাই শুনিলাম।

এক ব্যক্তি বলিতেছেন,—"এ বৎসর গরীব চাষা-লোকেই মারা যা'বে।"

অন্য ব্যক্তি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"গরীব চাষা-লোকে বরং মজুরী করে খেতে পার্‌বে, কিন্তু এই মধ্যবিৎ ভদ্রলোকেরই প্রাণ-বাঁচান ভার।"

এই সময় তৃতীয় ব্যক্তি সে কথার উত্তরে বলিলেন,—"বড় মানুষেরও রক্ষা নাই, চোরডাকাতের ভয়ে তাদেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি। যাঁর বাক্সে টাকা আছে, কি গোলায় ধান আছে, তারই প্রাণের ভয় বেশী।"

আমি বুঝিলাম, এই দুর্ভিক্ষে, ধনবান, মধ্যবিৎ ও দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকেরই ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া, শ্বশুর-বাড়ী যাইবার যে আনন্দ, তাহা কোথায় চলিয়া গেল; আমি বিষণ্ণ-মনে একপার্শ্বে বসিয়া নানা-প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। এসময় আমার অন্য চিন্তা কি ছিল? আমি কেবল দেশের অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলাম, আর মনে মনে বলিতেছিলাম,—"আমার 'সুজলাং সুফলাং' মা না রত্নপ্রসবিনী?—তবে বর্ষে বর্ষে এত দুর্ভিক্ষ কেন মা?"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি ডায়মণ্ড-হারবারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে আমার শ্বশুর-বাড়ী প্রায় এক ক্রোশ। আমি সেই এক ক্রোশ পদব্রজেই চলিলাম। এসময়ে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, আমি আমার শ্বশুর-বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। আমি এবাড়ীতে অনেকবার পূজা দেখিয়াছি; কিন্তু এবৎসরের মত এত কাঙ্গালীর ভিড় আমি কোন বৎসর দেখি নাই। শ্বশুর-বাড়ীর চারিদিকের মাঠ, বাগান, রাস্তা, ঘাট সমস্তই কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সেই জীর্ণশীর্ণ দেহ—দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত ছবি—সে ছবি দেখিলে এমন পাষণ্ড নাই, যে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারে! বিশেষতঃ সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা

গণের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ দেখিলে, প্রাণ ফাটিয়া যায়! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম!

অনেক কষ্টে সদর-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনও ব্রাহ্মণভোজন চলিতেছে; কিন্তু ভোজন শেষ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন একদিকে নানাবিধ মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি, আর অন্যদিকে পেটের জ্বালায় গড়াগড়ি—এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণগণ ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, 'আর না—আর না'—রবে চারিদিক কম্পিত করিতেছেন, তথাপি আরও মিষ্টান্ন তাঁহাদিগকে ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, আর সেই তিন-চারিদিনের অভুক্ত কাঙ্গালিগণ দূরে দাঁড়াইয়া লোলুপ-নয়নে এই দৃশ্য দেখিতেছে। তাহাদের তৎকালীন মনের অবস্থা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এ সংসারে এইরূপই প্রায় ঘটিয়া থাকে। লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে!

ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইলেই, একটা ভয়ানক হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। প্রবল স্রোতস্বিনীর বাঁধ হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের বেগ যেরূপ ভীষণ হয়, সেই অসংখ্য কাঙ্গালীর স্রোত সেইরূপ ভীষণ-বেগে ব্রাহ্মণগণের উৎসৃষ্ট পাতের উপর আসিয়া পড়িল। তখন সেই অস্পৃশ্য নীচ-জাতীয়গণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জাতিগণকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল। ব্রাহ্মণগণ যে যাহার জাতি-রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন; আর সেই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির কাঙ্গালিগণ, ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট দ্বারা যে যাহার জীবন-রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পুত্র মাতার গ্রাস কাড়িয়া খাইল, আর মাতা পুত্রকে লুকাইয়া বা কাঁদাইয়া আপনার উদর-পূরণ করিতে লাগিল। একটা কাড়া-কাড়ির গণ্ডগোলও উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মারামারিও চলিতে লাগিল।

আমার শ্বশুর-মহাশয় এই সকল কাণ্ড দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাঙ্গালী-ভোজনের হুকুম করিয়া দিলেন। একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠিল; সেটা কিন্তু আনন্দের ধ্বনি। আমি দেখিলাম, প্রায় পাঁচ ছয় হাজার কাঙ্গালী ঠেসাঠেসি করিয়া সেইস্থানে বসিল। কেহ ব্রাহ্মণের উৎসৃষ্ট পাতায় বসিল, কেহ বা একখানি নূতন পাতা পাইল। আমি আরও দেখিলাম, সেই পাতা পাইয়াই অনেক শীর্ণ-দেহের বিবর্ণ মুখে এখন হাসি আর ধরে না। সে হাসি দেখিয়া কিন্তু আমার চক্ষে জল আসিল! আমি আর থাকিতে পারিলাম না; 'জয় মা অন্নপূর্ণে'—বলিয়া কোমর বাঁধিয়া, পরিবেশনকারীর দলে মিশিয়া গেলাম। আমার আনন্দের সীমা নাই! আমি মাথায় করিয়া ভাত বহিতেছি—মাথায় করিয়া ডাউল বহিতেছি, আর পূজাবাড়ীকে একবারে শ্রীক্ষেত্র করিয়া ফেলিয়াছি। আমার সঙ্গে প্রায় একশত লোক এইরূপ বহিতেছে, তথাপি আমাদের বিশ্রাম নাই। রাত্রি আটটার সময় আমাদের কার্য্য শেষ হইল; আমরা মহানন্দে দল বাঁধিয়া হরিবোল-ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করিতে করিতে স্নান করিতে চলিলাম। আমি জীবনে সেরূপ আনন্দের সহিত কখনও হরির নাম উচ্চারণ করি নাই!

স্নানের পর আমি শ্বশুরবাড়ীর খিড়্‌কী দরজা দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই আমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেও আজ গাছকোমর বাঁধিয়া অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে অন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহার নিকট একখানি কাপড় চাহিলাম। সে অন্য একজনকে কাপড় আনিতে বলিল। দশ মিনিট পরে দেখি, আমার সম্মুখে কাপড়হস্তে এক অপরিচিতা সুন্দরী যুবতী দাঁড়াইয়মান! তাহার সেই সলজ্জভাব দেখিয়া,

আমিও লজ্জিত হইলাম। যুবতী কাপড় দিয়া চলিয়া গেল আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইনি কে?"

আমার স্ত্রী একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! আমি ত অবাক! এ বাড়ীর ঝি ত সেই পেমার মা, অন্তহীন—দন্তহীন—কৃষ্ণবর্ণা—লোলচর্ম্মা। তখন সেই পেমার-মার ফটোগ্রাফখানি কোথা হইতে আমার সম্মুখে আসিল। এই সময় আমার স্ত্রী বলিল,—"তুমি ঘরের মধ্যে যাও, আমি শিগ্‌গীর করে পারিবেশন শেষ করে যাচ্ছি।"

আমি ঘরের মধ্যে গিয়া গৃহিণীর প্রত্যাশায় বসিয়া আছি, এমন সময় আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—"তুমি কখন এলে বাবা? এতক্ষণ কি একবার বাড়ীর ভেতর আস্‌তে নেই?"

আমি বলিলাম,—"আমি যে এতক্ষণ পরিবেশন কর্‌ছিলাম মা।"

শাশুড়ী।—আমি তা দেখেছি। তা বাবা, কাঙ্গালী পরিবেশন কর্‌তে আবার তুমি গেলে কেন?

আমি।—আমি পরিবেশন কর্‌তে বড় ভালবাসি মা।

শাশুড়ী।—তা বাবা, ব্রাহ্মণভোজনের সময় পরিবেশন কর্‌লেই হতো। রাশি রাশি ভাত মাথায় করে যত সব ইতর ছোট লোকদের পরিবেশন করা কি বাছা তোমার ভাল হয়েছে? তাই

দেখে, পাড়ার মেয়েরা কত তোমার নিন্দে ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। তারা বলে, জামাই হয়ে একি কাণ্ড! তা বাবা, তোমার নিন্দে কি আমার প্রাণে সয়?

আমি।—মা, এরূপ দুঃখী-গরিবদের কেবল শুধু ভাত আর ডাল পেয়ে যেরূপ আনন্দ, আমাদের ব্রাহ্মণঠাকুরদের পোলাও গিলিয়ে পেলেও তত আনন্দ হয় না। এরা মা, যথার্থ কাঙ্গালী; আমাদের কলকেতায় আমরা এমন কাঙ্গালী বড় দেখি না; তাই মা, এই কাঙ্গালী পরিবেশন করতে আমার বড় আহ্লাদ হয়। এ ত আর নিন্দের কাজ নয়, মা।

এই সময় আমার স্ত্রীর বড়-ভগিনী এক জলযোগের বিরাট আয়োজন লয়ে উপস্থিত হইলেন। আমার শাশুড়ী তখন বলিলেন,—"একটু জল খাও বাবা। আহা! বাছা আমার দুপুরবেলায় এসেছে গা, আর এতখানি রাত হয়ে গেল, এখনও একটু জলপেতেও কেউ দিলে না!"

তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীর বড়-ভগিনী হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার জামাইকে আমরা চিনতে পারবো কি করে? মালকাঁচা মেরে ভাতের ধামা মাথায় করে ঘুরে বেড়ালে ত আর বাড়ীর জামাই হয় না, যে, আমরা তাড়াতাড়ি ডেকে এনে জলখাইয়ে দেবো!"

আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তখন আমায় দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল দিদি!"

দিদি এবার ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"তোমায় দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, এ লোকটি বুঝি কোন মহলের প্রজা—জমিদারের পূজো-বাড়িতে পরিবেশন করছে।

এসেছে ; না হয় বড় জোর কোন মহলের গোমস্তা বা নায়েব হবে —মণিব-বাড়ী—"

দিদি আর বলিতে পারিল না ; কারণ, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সেই বৈদ্যুতিক ঈষৎ হাসিটুকু এখন উচ্চ হাসিতে পরিণত হইয়াছে। দিদি ত হাসিয়া আমার সেই জল-খাবারের উপরেই ঢলিয়া পড়িতে লাগিল ; আর আমার শাশুড়ী রাগে যেন গর্‌গর্ করিতে লাগিলেন। তিনি সেখানে ছিলেন বলিয়া, আমিও আর দিদির কথার জবাব দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"দেখলে বাবা—দেখলে ! পাড়ার মেয়েরা ত বল্‌বেই, আমার ঘরের ঢেঁকি কুমিরের কথা শুনলে ? দ্যাখ্ প্রমদা, তোরা ঠাট্টা কর্‌তে হয়, অন্য সময় করিস্ ; এখন, বাছা আমার একটু জলও খায়নি, আর এই সময় তোর ঠাট্টা ! আহা ! কোন্ সকালে বাছা দুটি ভাত খেয়ে এসেছে ! হাঁ বাবা, বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছিলে ত ?"

আমি বলিলাম,—"হাঁ, আমি খেয়ে-দেয়ে দশটার ট্রেণে আসছি।"

"তা হলে ত সেই ন'টার সময় ভাত খেয়েছ, বাবা।" 'সেই ন'টার সময় ভাত খেয়েছ, বাবা' বলিতে বলিতে, আমার শাশুড়ীর চক্ষু হইতে দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ! সে বিন্দুদুটী কি অশ্রু—না অশ্রুরূপী স্নেহ ?

আমার স্ত্রীর বড়-ভগিনীর নাম প্রমদা। এই সময় প্রমদা বলিল,—"তোমার জামাই ত আর কচি খোকা নয়, মা। যখন বাড়ীরলোক সেজে পরিবেশন কর্‌তে পারে, তখন আর চেয়ে খেতে পারে না ?"

প্রমদার অধর-প্রান্তে কিন্তু এবার হাসির কোন চিহ্নই দেখিতে

পাইলাম না। আমার শাশুড়ী প্রমদার কথার কোন উত্তর না করিয়া আমায় বলিলেন,—"এস বাবা—এস, একটু জল খাও।"

আমি বলিলাম,—"মা, তিন-চার দিন যারা অন্নের মুখ দেখেনি, এমন ৪।৫ হাজার লোককে নিজের হাতে খাইতে এসেছি ; তখন আর কি আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে মা ?"

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"আমি ত সেইজন্যই বলছিলাম বাবা,—পরিবেশন করলে কি আর মানুষে খেতে পারে ? অত পরিশ্রম তোমার সহ্য হ'বে কেন ?"

প্রমদা এবার কিন্তু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ওমা, তোমার জামাইয়ের পরিবেশন করেই পেট ভরে গেছে ! তাতে কি আর পরিশ্রম হয়—পরিশ্রম হ'লে আর পেট ভরে যাবে কেন ? তাতে বরং বেশী খিদে হয়।"

আমি দেখিলাম, আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী আমার না খাওয়াইয়া এখনই সুস্থির হইবেন না। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও, আমি জলযোগে বসিলাম। আমার ক্ষুধা থাকুক না থাকুক, পিপাসা যথেষ্ট ছিল ; সুতরাং জলযোগ বিলক্ষণই হইল। একটু মিষ্টান্ন খাইয়াই এক গেলাস জল নিঃশেষ করিয়া, আমি আরও জল চাহিলাম। কে একজন ধীরে ধীরে এক গেলাস জল আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিল। আমি তখন ঘাড় হেঁট করিয়া জলযোগ করিতেছিলাম ; সুতরাং সেই অবস্থাতেই বলিলাম,—"আপনি এই গেলাসে জল ঢালিয়া দেন্।"

প্রমদা তৎক্ষণাৎ খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার শাশুড়ীঠাকুরাণীও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ও যে আমাদের ঝি !"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবার আমাদের ঝি! যে ঝি আমায় কাপড় দিয়াছিল, এ কি তবে সেই ঝি? আমি এবার বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। জলযোগ তৎক্ষণাৎ শেষ করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। আমি উঠিয়াই দেখি—সম্মুখে আমার সুরবালা।

সুরবালা আমার, স্ত্রীর নাম। সুরবালাকে দেখিয়া আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী আর প্রমদা সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ নূতন ঝি তোমরা কোথায় পেলে?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—"আহা! ও বড় গরীব, দু'দিন না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হয়। যখন আসে, তখন পরণের কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না। যে সময় চোখ-দুটী ছল্‌ছল্ করতে করতে আমার সম্মুখে দাঁড়ালো, তা দেখে আমার বড় দয়া হ'লো। আমাদের দু'তিন্‌টে ঝি রয়েছে, মা তাই কিছুতেই ওকে রাখ্‌তে রাজী হলেন্ না। আমি বল্লাম, আমি ওকে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় নিয়ে যাব। তাই এখন আছে, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে। আহা! কল্‌কাতায় যাবে শুনে, ওর যে কত আহ্লাদ!"

আমি বলিলাম,—"আমাদেরও সেখানে ত ঝি আছে।"

সুরবালা।—তা থাক; আমার খুকীর বড় অবস্থা হয়, ও আমার খুকীটা মানুষ করবে।

আমি।—মাইনে দিতে হবে কত?

সুরবালা।—মাইনে এক পয়সাও দিতে হবে না, কেবল খোর-পোস দিলেই হ'বে। সেখানে পাতের ভাত যা ফেলা যায়, তাই পেলেই ও বত্তে যাবে।

আমি।—কেবল খুকী মানুষ করবে, আর কাজকম্ম কিছু করতে পারবে না?

সুরবালা।—কাজকম্ম যা দেবে, ও তাই করবে। এমন পরিশ্রমী মেয়ে আমি দেখিনি। তবে বয়েসটা একটু খারাপ কি না, বাড়ীর বাহিরে কোথাও যেতে পারবে না। এখন, তোমার মত হলেই ওকে নিয়ে যাই।

আমি।—তোমার যখন মত হয়েছে, তখন আমার কি আর অমত হতে পারে?

সুরবালার আনন্দের আর সীমা নাই; সুরবালা আনন্দে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ হইতে দৌড়িয়া গেল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাও সুরবালা?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার যে মত হয়েছে, আমি একথা ঝিকে বলে আসি। শুনলে তার কত আহ্লাদ হবে।"

অল্পক্ষণ পরেই সুরবালা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সুরবালা, ও ঝির কি কেউ নেই?"

সুরবালা উত্তর করিল,—"কেবল দু'টী নাবালক ভাই আছে, আর এক পিসি আছে। সেই পিসি ছোট ভাই দুটীকে মানুষ করে; সে ওকে খাওয়াবে কোথা থেকে? আরও দ্যাখ, ওর চার বৎসর

বয়সের সময় বিয়ে হয়েছিলো, আর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় ও নাকি বিধবা হয়েছে।”

শেষের কয়েকটী কথা বলিতে বলিতেই, দুই বিন্দু অশ্রু সুরবালার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল; সুরবালা তৎক্ষণাৎ সে অশ্রু আমায় গোপন করিয়া ফেলিল। সুরবালা কি যথার্থই সুরবালা! আমি তখন অন্য কথা পাড়িলাম,—“এ অঞ্চলে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হয়েছে দেখ্‌ছি, তাতে অনেক গরীব লোকে না খেতে পেয়েই মারা যাবে।”

আমার মনের ভিতর ঐ কথাই তোলাপাড়া হইতেছিল বলিয়া, হঠাৎ আমার মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইয়া গেল; কিন্তু আমি দেখিলাম, আমার এ সময় একথার উল্লেখ করা ভাল হয় নাই। সুরবালা ছল্‌ছল্‌-নেত্রে আরম্ভ করিল,—“রোজ কত ভিখারী যে বাড়ীতে আসে, তা আর তোমায় কি বল্‌বো। একটি পয়সা পেলে কত আশীর্ব্বাদ যে করে, তা আর তোমায় কি জানাবো! হাতে পয়সা-কড়ি না থাক্‌লে, তাদের দেখে মনে বড় কষ্ট হয়।”

আমি বলিলাম,—“তোমার হাতে ত টাকা আছে। তুমি মনে কর্‌লে তাদের কিছু কিছু দিতে পার।”

সুরবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঘাড়টি হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—“সে টাকা কি আর আছে?”

আমি বলিলাম,—“সে টাকা তুমি কিসে খরচ কর্‌লে, সুরবালা?”

সুরবালা আর আমার কথার উত্তর দেয় না। আমি পুনরায় বলিলাম,—“তোমার টাকা তুমি খরচ করেছ; তা আমায় বল্‌তে আর ভয় কি?”

—

সুরবালা তখন ভয়ে ভয়ে বলিল,—"তুমি কিছু বল্‌বে না বটে, কিন্তু মা শুন্‌লে আমায় বড় বক্‌বেন। তোমায় বল্‌বো না কেন? আমি সে টাকা সব গরীব-দুঃখীদের দিয়েছি।"

সুরবালা আমায় স্বর্গ হাতে দিলেও আমার এত আহ্লাদ হইত না; কিন্তু আমি তখন সে ভাব প্রকাশ না করিয়া, এবার সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়িলাম,—"আচ্ছা সুরবালা, আজ তোমাদের বাড়ী পূজো, আর আজ তুমি এমন ছেঁড়া-কাপড়খানি পরে রয়েছ কেন?"

সুরবালা যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"ছেঁড়া কাপড় পর্‌লে কি জাত যায়, না মহাভারত অশুদ্ধ হয়?"

আমি তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"আমি সেভাবে বল্‌ছি না; তবে বল্‌ছিলাম কি—আজ আমি এসেছি, আজ একখানা ভাল কাপড় পর্‌তে নেই কি?"

সুরবালাও তখন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি কোন্ দু'খানা কাপড় নিয়ে এলে!"

আমি।—কেন তোমার কি কাপড় নেই?

সুরবালা।—থাক্‌লে আর পর্‌বো না কেন?

আমি।—কেন এখানে আস্‌বার সময় তুমি ১০।১২খানা কাপড় নিয়ে এসেছিলে; সে সকল কাপড় কি হ'লো?

সুরবালা।—যদি তুমি খানকতক কাপড় আন্‌তে, তবে সে কাপড় কি হলো তোমায় দেখাতুম্। তুমি বড় দুষ্ট, তুমি এক কাপড়ে কি করে এলে?

আমি।—আমি বুঝেছি, তুমি সে সকল কাপড়ও বিলিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, কাল সকালে আমি তোমায় দু'জোড়া কাপড় এনে দেবো।

সুরবালা আহ্লাদে গদগদ হইয়া হাসিতে হাসিতে ঘাড়টি ঝাঁকাইয়া বলিল,—"আর এই ছেঁড়া কাপড়খানি দুঃখী লোকে পেলে কত আনন্দ করে, আমিও তোমায় কাল সকালে দেখাবো।"

বা সুরবালা—বেস! আমি তখন অবাক হইয়া তাহার সেই মনোহর মুখভঙ্গিমা দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, কেহ স্বর্গ দেখাইতে চাহিলে আমার তখন এত আনন্দ হইত না। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর দিবস প্রাতে আমি সস্ত্রীক বাড়ী আসিলাম। আমাদের সঙ্গে সেই ঝিও আসিয়াছিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবা-মাত্র আমার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী সেই ঝিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন.—"এ মেয়েটি কে?"

আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! মাতাঠাকুরাণী তখন আশ্চর্য্য হইয়া ঝির আপাদমস্তক দেখিতে লাগিলেন। ঝির আপদ-মস্তক দেখিয়া, তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন। আমার স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারিয়া, মাতাঠাকুরাণীর চরণে প্রণত হইয়া আরম্ভ করিল,—"মা! তুমি একে রাখ্‌বে? এ বড় গরীব।"

আমার স্ত্রী যেরূপ মিনতি করিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট তাহার প্রার্থনা জানাইল, তাহাতে তিনি তখন আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—"গরীব হ'লেই কি বাছা, তাকে

ঝি রাখ্‌তে হবে—না গরীব হলেই ভাল ঝি হয়?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"না মা, কাজকর্ম্ম সব জানে, খুব পরিশ্রমী।"

মাতাঠাকুরাণী তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"বয়েসটা বড় খারাপ, অমন ঝি ঘরে রাখ্‌তে নেই।"

সুরবালা তখন পুনরায় বলিল,—"স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল মা।"

আমি দেখিলাম, সুরবালার এ কথাতেও মাতাঠাকুরাণীর মন উঠিল না। সুরবালার প্রাণের ভিতর যাহা হইতেছিল, আমি তাহা বুঝিলাম। সুতরাং আমি তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; তৎক্ষণাৎ জননীকে বলিলাম,—"মা, এ ঝিকে মাইনে দিতে হবে না, কেবল খেতে-পর্‌তে দিলেই হবে, তাই এনেছি। তা নইলে তোমার মত না নিয়ে কি আমরা ঝি আন্‌তে পারি?"

আমার এই কথাতেই মাতাঠাকুরাণী জল হইয়া গেলেন। তিনি এইবার প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"তা বাবা, তোমরা যখন এনেছ, তখন আমি কি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারি?"

তাহার পর তিনি ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি লোকের মেয়ে, বাছা?"

ঝি উত্তর করিল,—"আমি গয়লার মেয়ে।"

তখন তিনি ঝিকে রাখার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি করিলেন না। সুরবালার একটা ভয়ানক দুর্ভাবনা দূর হইল, সুরবালার এখন আনন্দের আর সীমা নাই। বলি সুরবালা, এ ঝি তোমার কে?

এক মাসের মধ্যেই এই ঝি, আমার মাতাঠাকুরাণীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইল। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথম কারণ—এ ঝিকে মাহিনা দিতে হয় না। দ্বিতীয় কারণ—ঝির খাওয়ায় কোন গোল নাই; পাতের ভাত দাও, পান্‌তা ভাত দাও, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করে না, শুধু ভাতে একটু লবণ পাইলেই সন্তুষ্ট। তৃতীয় কারণ—কলিকাতার ঝিদিগের ন্যায় বৎসরে ছয়খানা কাপড় আর চারি খানা গামছা, মাসে অর্দ্ধসের নারিকেল তৈল, পল্লিগ্রামের বিধবা হইলে পক্ষান্তে প্রতি একাদশীতে দুই আনা পয়সা প্রভৃতির কোন রূপ বন্দোবস্ত করে নাই। চতুর্থ কারণ— এ ঝির হাতটান নাই, পাড়া-বেড়ান নাই, কর্ক্কশ গলা নাই, হাজার বকিলেও কোনরূপ প্রত্যুত্তর করে না। পঞ্চম কারণ—এ ঝি আমার মাতাঠাকুরাণীর বড় সেবা করিত, তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, গায়ের ঘামাছি মারিয়া দিত, আর সময়ে সময়ে গা-হাত-পা টিপিয়াও দিত। ষষ্ঠ কারণ—এ ঝি বড় পরিশ্রমী, সমস্ত বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাটা প্রভৃতি বাড়ীর ভিতরের প্রায় সমস্ত কাজকর্ম্ম একাই করিত। আর যখন অবসর পাইত, তখন আমা শিশু কন্যটিকে কোলে করিত। ধোবা আসিতে বিলম্ব হইলে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিত। এই সকল গুণে সে ঝি আমার মাতাঠাকুরাণীর খুব প্রিয় হইয়াছিল। ঝির প্রতি এরূপ স্নেহ আমি জীবনে কখন দেখি নাই।

আমার আরও কারণ বলিবার ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতার পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত এতক্ষণ আমার উপর ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন যে, একজন থিনিমাইনের ঝিকে আর এত দূর করিতে হয় না। কিন্তু সে যে এতদূর করিত, তাহারও কারণ ছিল। সে দুই বেলায় দুইমুঠা ভাতের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছে, আর কলিকাতায় আসিয়া অন্যান্য ঝির দলে এখনও মেশে নাই—এমন কি

তাহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেও সুযোগ পায় নাই। সেই বাড়ীর অন্যান্য পরিবারের ন্যায় অন্দর-মহলেই থাকিত; কলিকাতার ঝি যে কি জিনিস, তাহা সে জানিত না।

মাতাঠাকুরাণী আমার সুরবালাকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন,—"বউ-মা, তোমার বাপের বাড়ীর দেশে এমন ঝি পাওয়া যায়, তা এতদিন বল নাই কেন বাছা?"

সুরবালা তখন হাসিতে বলিল,—"সব সময় কি পাওয়া যায় না? ভাল পেয়েছি, তাই এনেছি।"

মাতাঠাকুরাণী।—এমন লক্ষ্মী ঝি কিন্তু আমি কখন দেখি নি।

সুরবালা আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, মাতাঠাকুরাণীর এই কথা শুনিয়া আর এক জন মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিল। সে অন্য কেহ নহে—সে আমাদের ঝি।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! হাঁ, আমাদের ঝি তখন এক বৈদ্যুতিক হাসি হাসিল। সে লোক ভাল বটে, কিন্তু তাহার ঐ হাসিটুকু আমার ভাল লাগিল না। তাহার কিছুদিন পরে আমি দেখিলাম—পূর্ব্বে ঝির মুখে কখনও একটি কথা শুনি নাই, এখন তাহার মুখ ফুটিয়াছে, তাহার গলার শব্দ ও হাসির ধ্বনি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই শুনিতে পাইয়া থাকি। সে পূর্ব্বে বড় ধীর ছিল, অবনত-মস্তকে স্থিরভাবে সকল কার্য্যই করিত; এখন সে বড়ই চঞ্চল, সদাই ঊর্দ্ধদৃষ্টি, সদাই অস্থির। পূর্ব্বে সে অবসর পাইলে আমার শিশুকন্যাটিকে কোলে লইয়া

গৃহের মধ্যেই থাকিত; এখন সে অবসর পাইলে শিশুকন্যাটি কোলে করে বটে, কিন্তু এখন সে আর ঘরের ভিতর থাকিতে পারে না—হয় ছাদে, না হয় রাস্তার উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যদি নিবারণ করি, তবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে—"ঘরের ভেতর থাক্‌লে, খুকী যে কাঁদে।"

আমি দেখিতাম, তাহাকে ছাদ হইতে নামাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ খুকীর চীৎকারে বাড়ী কম্পিত হইত। খুকী নিজে কাঁদিত, কি তাহাকে কেহ কাঁদাইত, আমার সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। মাতাঠাকুরাণী প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। সেও এখন মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান আরম্ভ করিয়াছে। আমি একদিন দেখিলাম, গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সে সাংসারিক আবশ্যকীয় জিনিসপত্রও কিনিয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"মা, ও ঝিকে দোকানে পাঠিয়ে জিনিস-পত্র কেনাও কেন?"

মাতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"ও জিনিস-পত্র কেনে ভাল; অন্যে যে জিনিস চার্‌ পয়সায় আনে, সে জিনিস ও দু-পয়সায় আন্‌তে পারে। এই দেখ না, ঘি ফুরিয়ে গেছে বলে, দু'পয়সার ঘি এই সুমুখের দোকান থেকে কিন্‌তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম; তা কতখানি দিয়েছে, দেখ বাবা। আমাদের বুড়ো ঝি চার্‌ পয়সায় এত ঘি আন্‌তে পারে না।"

এই কথা বলিয়া, জননী আমায় ঘৃতের পাত্র দেখাইলেন,—সেই ঘৃত দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, আমাদের ঝিকে দেখিয়া মুদী বাটার মাথারই ঠিক ছিল না, সুতরাং সে ওজন ঠিক্‌ রাখিবে কিরূপে? সেই কারণ দুই পয়সার ঘৃত দিতে চারিপয়সার ঘৃত

দিয়াছে। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম,—"মা, জিনিস-পত্র ভাল কেনে বলে, ওকে আর দোকানে পাঠিও না। তোমার বউকে পাঠালে যদি আট পয়সার ঘি ছ'পয়সায় দেয়, তবে কি তুমি তোমার বউকে দোকানে পাঠাবে?"

আমার মনের ভাব তিনি বুঝিলেন কি না, জানি না, কিন্তু মাতাঠাকুরাণী এই কথায় যেন একটু বিরক্ত হইলেন। আমার সাক্ষাতে আর তাহাকে কোথাও পাঠাইতেন না বটে, কিন্তু আমার অসাক্ষাতে তাহাকে যে দোকানে পাঠাইতেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দোকানে কোন জিনিস কিনিতেই হউক, কি মাতাঠাকুরাণীর সহিত গঙ্গাস্নানেই হউক, একবার বাড়ীর বাহির হইলেই, ঝি একটা বিভ্রাট ঘটাইত। দোকানে গাইলে দোকানীর মুণ্ড ঘুরিয়া যাইত, ঝি-মহল তাহার রূপের হিংসায় তুষানলে জলিত, রাস্তার লোক হাঁ করিয়া ঝির রূপ দেখিতে দেখিতে হয় ত গাড়ী চাপা পড়িত। ঝি-মহলেও একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত; আর পাড়ার ভদ্র, অভদ্র, ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই একবাক্যে আমাদের ঝির রূপের সুখ্যাতি করিত।

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুন। কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার প্রায় পাঁচ-শত স্ত্রীলোক আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়। তাহাদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত-গৃহের রূপবতী ও যুবতী স্ত্রীলোক। একে রূপবতী, তাহাতে আবার নানা বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারাদিতে ভূষিতা; সুতরাং তাহাদের রূপের মাত্রা এককালীন আঠার আনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এহেন রূপবতীরাও একবাক্যে আমাদের ঝির রূপের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

আমার বোধ হয়, আমার সুন্দরী পাঠিকারা একজন ঝির এতাদৃশ রূপের প্রশংসা দেখিয়া, আমারই উপর বিরক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের রূপের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সে একজন ঝি বলিয়াই তাহার এতদূর রূপের প্রশংসা উঠিয়াছিল, নচেৎ একজন সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোক হইলে কখনই কেহ তাহার রূপের এতদূর সুখ্যাতি হইত না। সে যাহাহউক, এখন তাহার এতদূর রূপের সুখ্যাতির কিফল হইল, বলি শুন। সে যখন তাহার রূপের মূল্য বুঝিল, তখন হইতেই সেই রূপকে মাজিয়া ঘসিয়া সে আরও সেই রূপের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে আর ময়লা কাপড় পরিত না, ধোপা আসিতে বিলম্ব হইলে সাবান দিয়া কাপড় পরিষ্কার করিয়া লইত। আর আমি একদিন হঠাৎ দেখিয়াছিলাম যে, কাপড় পরিষ্কার করিতে করিতে সে সাবান গোপনে তাহার অঙ্গেতেও উঠিত। এখন দুই ঘন্টা না হইলে আর তাহার স্নান কিম্বা কাপড় কাচা হইত না। কেবল তাহাই নহে, আহারাদির বিষয়েও এখন তাহার লোভ জন্মিয়াছিল, পাতের ভাত কিম্বা পান্‌তা ভাত খাইতে হইলে তাহার মুখখানা গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। তবে এখনও এক গুণে সে, আমার মাতা-ঠাকুরাণী ও স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল; হাজার ভৎসনা কর, সে কলিকাতার ঝিদিগের ন্যায় কোনরূপ বিরক্তি করিত না।

ঝির আর এক গুণের কথা বলি, শুন। একদিন আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া আমি সকাল সকাল আফিস হইতে বাড়ী আসিয়াছি; বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ থিয়েটারের একটি গান, অতি মধুর বামাকণ্ঠে

সুরতানলয়ের সহিত সুন্দররূপে গীত হইতেছে। সে গান শুনিয়া, আমি অনেকক্ষণ বিস্মিতভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়াই সুরবালার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কে গান করে সুরবালা?"

সুরবালা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! আমি ত অবাক্ হইয়া সুরবালার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। গান তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, কিন্তু তাহার সেই সুমধুর কণ্ঠ আমার প্রাণের ভিতর অনেকক্ষণ ছিল। আমি সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাকে গান গাইতে কে শেখাইল?"

সুরবালা।—শেখাবে আবার কে? সেদিন আমাদের সঙ্গে থিয়েটার শুনতে গিয়ে, শিখে এসেছে। সে কথা যাক্, তুমি আজ এত সকাল-সকাল বাড়ী এলে যে?

আমি।—কেন? সকাল সকাল বাড়ী এসে তোমাদের আমোদে ব্যাঘাত কর্‌লেম নাকি?

সুরবালা।—তা এসেছ, বেস কর্‌ছে; তুমি ওদিকে এখন যেওনা। ঘোষেদের আর এই বিপিন বাবুর বাড়ীর মেয়েরা, আমাদের ঝির গান শুনতে এসেছে।

আমি।—তবে ত তোমাদের পুরো মজ্‌লিস্ করে ঝির গান শোনা হচ্ছিল! বড় আমোদেই ব্যাঘাত করেছি ত!

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"খুব আমোদ হচ্ছিল বটে; তা তুমি সকাল সকাল কেন এলে বল না?"

আমি বলিলাম,—"আমার বড় মাথা ধরেছে ব'লে, আমি সকাল-সকাল বাড়ী চলে এলাম।"

আমার মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া সুরবালার সেই প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। লজ্জাবতী লতাকে হঠাৎ স্পর্শ করিলে সে যেমন তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হইয়া যায়, আমার মাথা-ধরার কথা শুনিবামাত্র সুরবালার আহ্লাদে-প্রস্ফুটিত সেই মুখকমল বিষাদে ও লজ্জায় তৎক্ষণাৎ যেন সেইরূপ আকুঞ্চিত হইয়া গেল। সুরবালা তৎক্ষণাৎ আমায় বলিল,—"তুমি তবে মায়ের ঘরে চল, আমি সে ঘরের বিছানা এখনি করে দিচ্ছি।"

আমি এরূপ শত সহস্র মাথাধরা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সুরবালার বিষণ্ণ মুখ দেখিতে পারি না। সুতরাং সুরবালাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলাম,—"আমার এমন মাথা ধরেনি যে, আমায় শুয়ে থাক্‌তে হবে; আমি না হয়, বিপ্লিন্‌ বাবুদের লাইব্রেরিতে ব'সে খপরের কাগজ পড়িগে।"

কিন্তু আমার এ প্রস্তাবে সুরবালা রাজী হইল না, এবং আমি তাহার সেই বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন করিতেও পারিলাম না। সুরবালা দৌড়িয়া গিয়া আমার ঘরের মজলিস্‌ ভাঙ্গিয়া দিল এবং আমি ঘরে গিয়া শয়ন করিতে বাধ্য হইলাম।

এই সকল ঘটনায় আমাদের ঝির রূপের ও গুণের অহঙ্কার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর ক্রমে সে যেন কেমন-কেমন হইয়া গেল। আমার মাতাঠাকুরাণী সেকেলে স্ত্রীলোক, তিনি অত বুঝিতে পারিতেন না; কিন্তু আমার সুরবালা তাহার রকম-

রকম দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিল। আমার সুরবালা সে ঝিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত বলিয়া তাহার এরূপ পরিবর্ত্তনে প্রাণে বড় ব্যথা পাইল। আর প্রাণে ব্যথা পাইবার আর একটি কারণ ছিল। সে ঘৃণার কথা আমি নিজের মুখে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, সুরবালার মুখেই তোমরা শুন। একদিন রাত্রে হঠাৎ সুরবালা আমায় বলিল,—"আমি ছাড়া তুমি এ পৃথিবীর আর কোন স্ত্রীলোককে ভালবাস কি না?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমিত অবাক্ হইয়া প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে মুখখানি এখন যেন রাহুগ্রস্থ পূর্ণশশী। সুরবালার মুখ হইতে এরূপ প্রশ্ন যে আমায় কখন শুনিতে হইবে, আমি সে কথা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। সুতরাং আমি আর উত্তর করিব কি? সুরবালা তখন আমায় মিনতি করিয়া বলিল,—"আমি তোমার মন জানি, তুমি নিষ্কলঙ্ক, তোমার সেই নির্ম্মল মনে কখন পাপস্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু আমি পাপী, তাই আমার মনে একটা সন্দেহ হয়েছে; তোমার মুখের কথায় আমার মনের সে সন্দেহ দূর হয়ে যাবে বলেই, তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

আমি বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরবালাকে বলিলাম,—"কি, আমার প্রতি তোমার সন্দেহ! আমি এমন কি কাজ করেছি যে, আমার প্রতি তোমার এ সন্দেহ হলো?"

সুরবালা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"তোমার প্রতি কি আমার সন্দেহ হতে পারে? তোমার প্রতি নয়, সে একজন স্ত্রীলোকের প্রতি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি

ছাড়া এ পৃথিবীর আর একজন স্ত্রীলোক তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসে।'

আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে সে স্ত্রীলোক ?"

সুরবালা আমার মুখের সম্মুখে গম্ভীরভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"সে স্ত্রীলোক—আমাদের ঝি।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি ! আমার মাথায় যেন তৎক্ষণাৎ এক ভীষণ বজ্রাঘাত পড়িল ! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যখন পুনরায় দর্শনশক্তি ফিরিয়া পাইলাম, তখন প্রথমেই দেখিলাম, সুরবালার, চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুজল ! দুইটী বিন্দু অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি অকূলসাগরে পড়িলাম। আমার মুখেও আর কথা নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সুরবালা সেই অশ্রুবিন্দু মুছিয়া আমায় বলিল,—"এ ছুঁড়ীর এত দূর আস্পর্দ্ধা হবে, তা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনি। তা হলে কি আমি এ কাল-সাপকে ঘরে আনি।"

আমি বলিলাম,—"কিসে তোমার এ সন্দেহ হলো, সুরবালা ?"

সুরবালা।—দেখ, লোকে কথায় বলে,—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। আমি সে ভালবাসা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু আর কেউ পার্‌বোনা।

আমি।—তবু কি করে বুঝতে পার্‌লে, তা আমায় বল্‌বে না?

সুরবালা।—কিসে এ সন্দেহ হলো, তবে বলি শুন। আমি দেখ্‌ছি, এখন তোমার সম্মুখে ঘুরে বেড়াতে সে কেবল ভালবাসে; তোমায় জল, পান কি আর কিছু দিতে বল্‌লে, সে যেন স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পায়। তোমার গলার সাড়া শুন্‌তে পেলে, অন্যমনস্ক হয়। আমি কি নেকী?

আমি।—এতেই তোমার মনে এতদূর সন্দেহ হলো আমি তার মনীব, পিতার তুল্য; সে জন্যেওত সে এসকল কর্‌তে পারে।

সুরবালা এবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তোমরা পুরুষ, স্ত্রীলোকের মনের কথা বোঝ্‌বার ক্ষমতা তোমাদের আছে কি? সে যদি মনীব বলে এ সকল কর্‌তো, তা হ'লে তাই দেখে আমার মনে এতদূর কষ্ট হবে কেন? দেখ, মনই ধর্ম্ম, মন সব জান্‌তে পারে। আর এক দিনের একটা ঘটনার কথা বলি শুন, তুমি সে দিন বাড়ীর ভিতরের বারাণ্ডায় বসে তেল মাখ্‌ছো, আর ও ছুঁড়ী ছাতের আল্‌সের ধারে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ছে, আর আঁচল দিয়ে চোখের জল পুঁছ্‌ছে। আমি পেছনে ছিলুম, সে আমায় দেখ্‌তে পায়নে, আর আমিও তখন তাকে আর দেখা দিলুম না, কিন্তু আমার মনে হলো যে এখনি বেটীকে ছাদ থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দি।"

আমি সুরবালার কখন রাগ দেখি নাই, এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাহার যেরূপ রাগ দেখিলাম, সে ঘটনার সময় সুরবালার যে কিরূপ রাগ হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং তাহার রাগ দেখিয়া আমারও বড় রাগ হইল, আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম,—"বেটীকে তবে ঝাটা মেরে দূর ক'রে দাও।"

আমার এ প্রস্তাবে সুরবালা সম্মত হইল না, সে তৎক্ষণাৎ বলিল,—"দু'বৎসর আছে, আর কি করে তাড়িয়ে দেবো? আর তাড়িয়ে দিলে, হয় বেশ্যা হবে, না হয় না খেতে পেয়ে মরে যাবে। আমি সে কাজ কি করে পারি?"

এখন সুরবালার হৃদয় তোমরা বুঝিয়াছ কি? আমার এ প্রস্তাবে সুরবালার রাগ কোথায় উড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে আমার রাগের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। আমি পুনরায় বলিলাম,—"অমন ঝিকে বাড়ীতে রাখ্‌তে নেই।"

সুরবালা এবার মার দোহাই দিয়া বলিল,—"মার কিন্তু এবিষয়ে মত হবে না।"

আমি জানিতাম, সে কুহকিনী আমার মাতাঠাকুরাণীকে যাদু করিয়াছে, সে যে কি কুক্ষণে তাঁহার পাকা চুল তুলিতে আর গায়ের ঘা-মাছি মারিতে আরম্ভ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সেই হইতে সে আমার মাতাঠাকুরাণীর বড় প্রিয়। তথাপি আমি বলিলাম,—"আমি যদি মার মত কর্‌তে পারি।"

সুরবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মার যদি মত হয়, তবে যা ভাল বিবেচনা হয় কর।"

আমি সুরবালার কথার অর্থ বুঝিলাম, কিন্তু সেই দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আমি ঝির সম্বন্ধে বলিলাম,—"মা, আমাদের ঝি যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, এখন আর সেরূপ নেই, আমি অমন ঝিকে বাড়ীতে রাখ্‌তে ইচ্ছে করি না।"

মাতাঠাকুরাণী কিছু দুঃখিতা হইয়া বলিলেন,—"বয়েস-কালে অমন হ'য়ে থাকে বাবা, তা বলে কি তাড়িয়ে দেওয়া ভাল হয় ?"

আমি বলিলাম,—"অমন ঝি কি ভদ্রলোকের বাড়ীতে রাখে ?"

মাতা।—তুমিই ত এনেছিলে বাবা, এখন কুটুম্ব-বাড়ী থেকে এনেছ, বিনি দোষে তাড়িয়ে দিলে তারাই বা কি বল্‌বে ?

আমি সুরবালার সন্দেহের কথা মাতাঠাকুরাণীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার কথার আর উত্তর দিব কি ? অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। মাতাঠাকুরাণী তখন আরম্ভ করিলেন,—"মাইনে দিতে হয় না, গতরও বেশ আছে, এমন ঝি পাবে কোথা বাবা ?"

এই সময় আর একটা কথা আমার মনে উদয় হওয়ায় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম। গেলাম আর কোথায় ? সেই আমার সুরবালার কাছে। আমি গিয়া দেখিলাম, সুরবালার সেই প্রফুল্ল মুখকমল এখন মলিন। আমায় দেখিয়া সুরবালা সেই মলিন মুখখানি আমার মুখের সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—"মার কি মত হয়েছে ?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না।"

সুরবালার সেই মলিন মুখ আমার ঐ ক্ষুদ্র কথাটিতে তৎক্ষণাৎ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া ঝির কথা ভুলিয়া গেলাম।

দেখিতে দেখিতে, তাহার পর এক মাস গত হইয়া গেল; বিনা কারণে সুরবালার যে এরূপ সন্দেহ হয় নাই, আমিও তাহা এই সময়ের মধ্যে বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি ঘৃণায় ও লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলাম। এক দিন প্রাতে আমি বারান্দায় বসিয়া

সংবাদ-পত্র পড়িতেছি, আর আমাদের ঝি আমার শিশু কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদে বেড়াইতেছে। তাহার প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু আমার সুরবালা গৃহের ভিতর হইতে বলিল,— "কেবল পড়ছো, না আর কিছু দেখ্‌ছো।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি দেখ্‌বো সুরবালা ?"

সুরবালা বলিল,—"একবার তবে উপর-দিকে চেয়ে দেখ দেখি।"

আমি দেখিলাম, আমাদের ঝি এক একবার আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে দেখিতেছে, আর সেই ক্রোড়স্থিত শিশু কন্যাটির মুখ-চুম্বন করিতেছে! সে যেরূপভাবে চাহিতে চাহিতে আমার কন্যাটির মুখচুম্বন করিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমার যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হইল। হঠাৎ বৃশ্চিক দংশন করিলে যেমন আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর সেইরূপ জ্বলিতে লাগিল। আমার স্ত্রী ঘরের মধ্যে থাকিলেও জানালা দিয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল; অথচ ঝি তাহাকে ছাদ হইতে দেখিতে পায় নাই। আমি তাহার দিকে চাহিলে সে এরূপ কদর্য্য হাসি হাসিল যে, আমি আর সেস্থানে থাকিতে পারিলাম না। আমি সে স্থান হইতে ঘরের মধ্যে আমার স্ত্রীর নিকট আসিলাম। আমার স্ত্রীর মুখ দেখিয়াই আমি তাহার ক্রোধের লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। সুরবালা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—"এত বড় আস্পর্দ্ধা —বামন হয়ে চাঁদে হাত! আর না—এখনি ঝাটা মেরে দূর করে দাও।"

আমারও তখন বড় রাগ হইয়াছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সেই ঝিকে ডাকিয়া বলিলাম,—"তুমি ভদ্রলোকের বাড়ী থাক্‌বার

উপযুক্ত নও, এখানে তোমার আর স্থান হবে না, আজই দূর হও।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝির চক্ষে জল আসিল। দুই এক ফোটা করিয়া ক্রমে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিল। ঝি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরবালাও তাহাকে কি কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিয়া সুরবালার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া, ঝি কাঁদিতে কাঁদিতেই আরম্ভ করিল,—"কেন?—আমি কি দোষ করেছি? দু'বেলা দু'মুটো খাই বইত নয়, তা নয় এক বেলা খেয়েও থাক্‌বো। ওগো আমি খুকীকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না গো, তোমরা আমায় তাড়িয়ে দিলে আমি খুকীর জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে যাব।"

তাহার সেই মায়া-কান্না শুনিয়া আমার কোন দুঃখই হইল না, বরং মায়াবিনীর মায়া দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। কিন্তু আমি সুরবালার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখি যে, তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। ধন্য সুরবালা! ধন্য তোমার হৃদয়!

এই সময় আমার মাতাঠাকুরাণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই আরম্ভ করিলেন,—"দেখ বউমা, তুমি সে সন্দেহ করো না মা, আমার ছেলে সে রকম কলিকালের ছেলে নয়।"

মাতাঠাকুরাণীর এই কথায় আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। তবে কি সুরবালার সন্দেহের কথা মাতাঠাকুরাণীও জানিতে পারিয়াছেন! তিনি সে কথা জানিতে পারিয়াছেন শুনিয়া, আমি যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম। 'আমার উপর তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ যাহাতে না হয়, সেই কারণ আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"মা,

এ পাপ ঘরে রাখ্‌বার আর কোন আবশ্যক নাই। তাড়িয়ে না দিয়ে যেখানকার পাপ সেইখানেই ওকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। আজ্‌কের দিন থাক্, কাল সকালে আমি একজন লোক সঙ্গে দিয়ে ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে দেবো। এ বিষয়ে তুমি আর অমত করো না।"

আমি যেরূপভাবে এ কথা বলিলাম, তাহাতে মাতাঠাকুরাণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন,—"তবে তাই কর বাবা। তোমার আর বউমার যখন এই মত, তখন আমি কি অমত কর্‌তে পারি?"

আমি আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, সে ঝি আজ জলস্পর্শও করে নাই, কেবল সমস্ত দিন শয্যায় শুইয়া কাঁদিয়াছে। কথাটা শুনিয়া, আমারও মনে বড় কষ্ট হইল। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম,—"তুমি একটু যত্ন করে খাওয়ালে না কেন?"

সুরবালা মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বলিল,—"আমি কি সে চেষ্টার কসুর করেছি? সে বলে, আমার যখন এ বাড়ীর অন্ন উঠেছে, তখন আর খাবো কেন?"

আমি বলিলাম,—"তা বলে একটা লোক বাড়ীর মধ্যে না খেয়ে পড়ে থাক্‌বে!"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"তুমি একবার তাকে খেতে বলে দেখ না।"

আমি প্রথমে সুরবালার কথায় সম্মত হইলাম না, কারণ তাহার নিকট যাইতে কিম্বা তাহার সহিত কথা কহিতে আমার কেমন এখন বড়ই ঘৃণা হয়। কিন্তু সুরবালা আমায় অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন আমি সুরবালাকে বলিলাম,

—"তুমি আমার সঙ্গে যদি যাও, তা হলে আমি তাকে খেতে বল্‌তে যেতে পারি।"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ আমার কথায় সম্মত হইল। আমরা উভয়ে উপর হইতে নীচে সেই ঝির ঘরে গেলাম। ঝি আমার গলার শব্দ শুনিয়া একখানি লেপে আপাদমস্তক ঢাকিল। আমি তাহাকে বলিতে লাগিলাম,—"গৃহস্থের বাড়ী সমস্ত দিন না খেয়ে পড়ে থাক্‌লে, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তুমি বাছা, আমাদের অকল্যাণ কেন কর? আমরা তোমায় ধরে মারিনে বা কোন গালমন্দও দিইনে; তবে তোমার বুদ্ধি ভাল নয় বলে, তোমায় দেশে পাঠিয়ে দেবো। আবার যদি শুনি, তোমার বুদ্ধি ভাল হয়েছে, তা হলে আবার তোমায় নিয়ে আস্‌বো। আর বাড়ীতে তুমি যদি খেতে না পাও, তবে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে যাতে খেতে পাও, আমি বরং তার উপায় করে দেবো। এখন আমার কথা রাখ, গৃহস্থের অকল্যাণ কর না, উঠে ভাত খাও। আমি তোমার—"

এখন, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমি দেখিলাম, আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝি উঠিল, তাহার পর সুরবালা তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া আহার করাইল। ঝির সম্বন্ধে আর কোন কথাই সন্ধ্যার পর হইল না, কেবল পর দিন প্রাতে কে তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইবে তাহা স্থির করা হইল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি নিদ্রার ঘোরে শুনিলাম, "সদর দরজা খোলা কেন—সদর দরজা খোলা কেন" এই কথা বলিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী চীৎকার করিতেছেন। তখনও আমার নিদ্রা

সম্পূর্ণ ভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং এই কথাটা আমার কানে গেল মাত্র, তাহার পর-মুহূর্ত্তেই আমি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইলাম জানি না, কিন্তু এবার আমার স্ত্রীর চীৎকারে হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সুরবালা চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—"পালিয়ে গেল!—এই কল্‌কেতা সহরের মধ্যে এক্‌লা যেতে তার সাহস হলো! ওমা আমি যাবো কোথা!"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর-মুহূর্ত্তেই আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—"কে পালিয়ে গেল সুরবালা?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল,—"আমাদের ঝি।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! যে ঝিকে ছাড়াইয়া দিব বলায় সে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, সেই ঝি নিজে আমাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। অনেকক্ষণ কোন কথাই আমার মুখে আসিল না। তাহার পর পাড়ার পরিচিত বাড়ীতে তাহার অনুসন্ধান জন্য লোক পাঠাইলাম; কিন্তু কেহই তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। ঝির সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিল, আমার মাতাঠাকুরাণী ও স্ত্রী সে সকল কথা শুনিয়া ঝির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিশেষ দুঃখিত। আমি আর কি করির? পুলিসে সংবাদ দিলাম এবং অনেক কুলি-আফিস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিছু কিছু জানা ছিল। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া আমি

সাধারণ পীড়ার চিকিৎসায় কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমার গৃহে অনেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধও থাকিত। অনেক দীনদুঃখীকে আমি সে সকল ঔষধ বিতরণ করিতাম। ব্যবসার জন্য আমি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করি নাই, সেই কারণ পাড়ার অনেক ভদ্রলোক পর্য্যন্ত আমার দ্বারা চিকিৎসিত হইতেন। একদিন রবিবার বৈকালে আমি আমার বৈঠকখানায় বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেছি, এমন সময় একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় বলিল,—"বাবা, আমার একটি মেয়ে আজ পাঁচদিন একাজ্বরী হয়ে রয়েছে, এখনও একটু অযুধ পেটে পড়েনি। দুঃখী লোক—ডাক্তারের কড়ি নাই; তুমি যদি বাবা, আমাদের বাড়ী এসে, তাকে দেখে একটু অযুধ দাও।"

বৃদ্ধার কাতরোক্তি শুনিয়া আমার বড় দয়া হইল, আমি তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি ঔষধ বিতরণ শেষ করিলাম। তাহার পর আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথে বৃদ্ধার সঙ্গে আমার নিম্নলিখিত কথোপকথন চলিতে লাগিল।

আমি।—তোমার বাড়ী কতদূরে বাছা?

বৃদ্ধা।—বেশী দূর নয়—এই চাঁপাতলার গোল-পুকুরের ধারে।

আমি।—গোলদিঘির কোন্ ধারে?

বৃদ্ধা।—পূব্ ধারে।

আমি।—পূর্ব্বধারে যে সকল খোলার ঘর আছে, সেই খোলার ঘরে বুঝি?

বৃদ্ধা।—হাঁ বাবা, শ্যামা বাড়ীওয়ালির বাড়ী।

আমি জানিতাম, চাঁপাতলার গোল-দিঘির পূর্ব্বধারে যে সকল

খোলার ঘর আছে, তাহাতে নীচ-শ্রেণীর বেশ্যারা বাস করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে ঝি-শ্রেণীর বেশ্যাই অধিক। ইহারা দিবা-ভাগে গৃহস্থের কিম্বা বাসাড়ে বাড়ীতে ঝিয়ের কর্ম্ম করে, আর রাত্রে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে; সুতরাং আমি যেরূপ উৎসাহের সহিত আসিতেছিলাম, গন্তব্য স্থানের নাম শুনিয়া আমার আর সে উৎসাহ রহিল না। তথাপি সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কন্যার বয়েস কত?"

বৃদ্ধা।—১৪।১৫ বছর হবে।

আমি।—স্বামী আছে?

বৃদ্ধা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না বাবা, সে পাঁচ বছর বয়েসের সময় বিধবা হয়েছে।"

আমি।—তোমার আর কে আছে?

বৃদ্ধা।—আমার আর কেউ নেই।

আমি।—তবে তোমার চলে কিসে?

বৃদ্ধা আর আমার কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। সে আমার এরূপ প্রশ্নে নিরুত্তর থাকাতেই, আমার উত্তর আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। আমার যাহা সন্দেহ হইয়াছিল, এখন সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। কিন্তু আমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে সুস্থান-কুস্থান বা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করা আমার উচিত নহে। সুতরাং আমি পুনরায় উৎসাহের সহিত চলিলাম। এই সময় একটা কথা আমার মনে উদয় হওয়ায়, আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ ভাড়াটে আছে?"

বৃদ্ধা।—বিধু আছে, গোলাপ আছে, রাইমণি আছে, সুখদা আছে, আর শ্যামা বাড়ীওয়ালী আছে।

আমি।—এ সকলইত স্ত্রীলোক—এরা কি করে?

বৃদ্ধা।—দিনের বেলা কেউ থাকে না, বাবুদের বাড়ী কাজ কর্‌তে যায়, সন্ধ্যের পর ঘরে আসে।

সন্ধ্যার সময় কেন ঘরে আসে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি সে কথা তখন মনে মনে বুঝিতে পারিলাম। ইহারাই কলিকাতার ঝি! পোনের আনা উনিশ গণ্ডা ঝিই প্রায় এইরূপ! তবে যাহারা বৃদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। আর তাহাদের মধ্যে যাহাদের কিছু অর্থ বল আছে, তাহারা প্রায় হয় বাড়ীওয়ালী, না হয় মুদিনী, ফল-বিক্রেতা, বা অন্য কোন ক্ষুদ্র ব্যবসার দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ধন্য কলিকাতা! ধন্য তোমার নৈতিক উন্নতি!! তোমার সংসর্গে আসিয়াই পল্লীগ্রামের অনাথা স্ত্রীলোকগণ তাহাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত করে!

আমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই বৃদ্ধার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র, একজন স্থূলকায় প্রৌঢ়া আসিয়া আমায় বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিল। তাহার সমাদরে আমি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম। বৃদ্ধা বলিল,—"মহাশয়, আপনি বড় ভদ্রলোক, আপনার অনেক সুখ্যাতি আমি শুনেছি। যখন গরীবের বাড়ী পায়ের ধূলা পড়েছে, তখন অনুগ্রহ করে একবার বসুন। আপনি তামাক খান কি?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"আমার আদর-অভ্যর্থনার

কোন দরকার নেই ; যেজন্যে এসেছি, সেই কাজ শেষ করে, এখনি আমায় যেতে হবে। সে রোগী কোথায় ?”

স্ত্রীলোকটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—“রোগী ঐ ঘরের মধ্যেই আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এখনি রোগীকে দেখতে পাবেন।”

আমি তাহার ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তথাপি বলিলাম,—“সে রোগী এখন কেমন আছে ?”

স্ত্রীলোক।—আপনি যখন এসেছেন, তখন তার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

তাহার কথার অর্থও বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—“আপনার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, আমার হাতে অনেক কাজ আছে, আমি আর সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। ইচ্ছা হয় রোগী দেখান, না হয় আমি এখনি চলে যাই।”

আমাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোকটি বলিল,—“তবে আসুন মশাই, আগে রোগী দেখ্‌বেন, তার পর না হয় কথাবার্ত্তা হবে ; আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।”

এই কথা বলিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া সম্মুখের একটি ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। কিন্তু আমি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। যদি তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত হইত, তাহাতেও আমি এতদূর স্তম্ভিত হইতাম না। আমার মনে একটা সন্দেহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে কথা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলাম। দেখিলাম আর কি ?

আমাদের সেই ঝি দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তখন আমি ইহাদের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম; ঘৃণায় ও লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমার মুখে আর কথা নাই। ঝিও আমায় মুখে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু আর সেই চক্ষের জল আমায় অনেক কথা বলিল। আর বলিল—সেই বাড়ীওয়ালী। সে এইবার আরম্ভ করিল,—

—"বাবা, তোমায় আর কি বল্‌বো? ছুঁড়ী তোমার জন্যে সারা হয়ে গেল। খায় না, দায় না, কেবল তোমার জন্যে ভাবে আর কাঁদে। যেরূপ গতিক দেখ্‌ছি, তুমি পায়ে না রাখ্‌লে ত একটা স্ত্রী হত্যে হয়। ছুঁড়ী কি চক্ষেই তোমায় দেখেছিলো বাবা! আমি অনেক—"

এই সময় আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম; সুতরাং এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন কালসর্প দেখিলে পথিক যেমন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে, আমিও সেইরূপ প্রাণভয়ে দৌড়িলাম। তৎক্ষণাৎ একটা ভারিবস্তু পতনের শব্দ আমার কর্ণে গিয়া পৌছিল। আমার বোধ হয়, সেই ঝি বুঝি হঠাৎ পড়িয়া গেল। আমি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া যখন পৌছিলাম, তখন সেই বাড়ীওয়ালীর চীৎকারেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুমান সত্য হইয়াছে। কিন্তু সে ঝি যে মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা আমার মনে একবারও উদয় হয় নাই। রাস্তায় আসিয়া পৌছিয় আমি, দ্রুতপদে বাড়ার দিকে চলিলাম। আমার মনের অবস্থা কিরূপ তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন এই মাত্র কোন গুরুতর পাপকার্য্য শেষ করিয়া

গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি। লোকে খুন করিলে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হয় জানি না; কিন্তু একটা পাপ-অভিসন্ধির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমার মনের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, একটা খুন করিলে ইহার অধিক কি হইত, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু মনের গ্লানি এখনও দূর হয় নাই। তখন কোন নিষ্কলঙ্কমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমি আমার শয়নগৃহে গেলাম। সে গৃহে প্রবেশ করিয়াই সুরবালার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সুরবালা আমার পরিবর্ত্তিত আকার দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি হঠাৎ সুরবালার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। সুরবালা এবার একটু অধীর হইয়া বলিল,—"কোথায় গিয়েছিলে, বল না?"

আমি বলিলাম,—"সুরবালা, আজ ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন, আমি বড় বিপদে পড়েছিলুম।"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"সে কি! কি বিপদ?"

আমি বলিলাম,—"রোগের ভাণ করে সেই পাপিয়সী আমায় বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছিল।"

সুরবালা বিস্মিতস্বরে বলিল,—"কে সেই পাপীয়সী?"

আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম,—"আমাদের ঝি।"

নবম পরিচ্ছেদ।

আমাদের ঝি! সুরবালা অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের ছবি নিশ্চয়ই মুখে প্রকাশ পায়, কারণ সুরবালা আমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয়ের ভাবও বুঝিতে পারিয়াছিল। সুরবালার প্রথম কথা হইল,—"ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করেছেন। কিন্তু কোথায়—কি করে তোমায় বিপদে ফেল্‌বার চেষ্টা পেয়েছিল, আমায় সে সব কথা খুলে বল।"

আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সুরবালা অবাক্ হইয়া সমস্ত কথা শুনিল। তাহার পর বলিল,—"আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। সে নিজে অধঃপাতে যাবে, যাক্। তার প্রতি আমার আর দয়ামায়া নাই। কিন্তু তার আস্পর্দ্ধা দেখ! সে এখনও তোমায় নষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছে!"

আমি বলিলাম,—"সে কুচরিত্রা, তার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে?"

সুরবালা।—আমি ত তার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট করিনি, তবে সে আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করে কেন?

আমি।—সংসারের গতিই এই। তুমি যার ভাল কর্‌বে, সেই তোমার মন্দ চেষ্টা পাবে।

সুরবালা।—কেন এমন করে? তাহার ত মানুষের চামড়া গায়ে আছে।

আমি।—মানুষের চাম্‌ড়া গায়ে থাক্‌লেই যদি সকলেই মানুষ হতো, তা হলে কি সংসারে কোন দুঃখ থাক্‌তো?

সুরবালা।—তবে আমার অদেষ্টে বোধ হয় দুঃখ আছে, তা না

হলে এত লোক থাক্‌তে আমারই সর্ব্বনাশ কর্‌তে চেষ্টা পাবে কেন?

আমি।—সুরবালা, তুমি সে ভয় করোনা; ধর্ম্মে যদি আমার মতি থাকে, আর জগদীশ্বর যদি আমার সহায় থাকেন, তবে আমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। আমার প্রতি তোমার কি বিশ্বাস নাই সুরবালা?

সুরবালা এবার বিষণ্ণমুখে বলিল,—"তোমার প্রতি বিশ্বাস যেদিন হারাবো, তার পূর্ব্বেই আমার যেন মৃত্যু হয়।"

সুরবালার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আর সেই বিষণ্ণ মুখের ঐ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া, আমার মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইল, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এবার অন্য কথা পাড়িলাম। আমি বলিলাম,—"সুরবালা, তোমার মন যেমন সরল, তুমি অন্যকেও তেম্নি ভাব। সকল লোকের মন কি কখন সমান হয়?"

সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আমি তা কি করে জান্‌বো? কেন এ কালসাপকে ঘরে এনেছিলাম।"

আমি।—যখন তাকে এখানে এনেছিলে, তখন সে কিছু কাল সাপ ছিল না। তখন তার চরিত্র খুব ভালই ছিল।

সুরবালা।—তবে এখন তার এমন মতিগতি হলো কেন?

আমি।—এ কেবল তার সংসর্গের দোষ। দেশেতে সে উদরান্নের জন্য লালায়িত ছিল; কোনরূপ কুপ্রবৃত্তি কেহ তার মনে উদ্রেক করিয়া দেয় নাই। সেই কারণ তার চরিত্রেও কোনরূপ কলঙ্কস্পর্শ করে নাই। এখানে এলে তার পেটের চিন্তা ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে বরং ভোগাভিলাষও বেড়ে গিয়েছিলো। আর এই কল্‌কেতা সহরে কুলোকের অভাব নাই, যখনই বাড়ীর

বাহিরে গেছে, তখনই কুলোকে তার কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করেছে। তার মনেরও সেরূপ ধর্ম্মবল ছিল না, কাজেই তার চরিত্র মন্দ হয়ে গিয়েছে। কেবল আমাদের ঝি বলে নয়, এই কল্‌কেতা সহরে এসে এরূপ শত-সহস্র পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোকের চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে—আর প্রতিদিনই হচ্ছে।"

আমার কথা শুনিয়া সুরবালা অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরবালার মুখে আর কথা নাই। আমি তাহার বিস্ময়ভাব দেখিয়া আর কোন কথা বলিলাম না। কিন্তু সুরবালা তৎক্ষণাৎ বলিল—"আমি তোমার কথা শুনে অবাক্ হয়েছি। পৃথিবী এত পাপ কি করে সহ্য করে?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তোমার চেয়ে পৃথিবীর সহ্যগুণ ঢের বেশী। কিন্তু সুরবালা, এই সকল হতভাগিনীর প্রতি ঘৃণাও হয়, আবার দয়াও হয়। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, কেবল কুলোকের উত্তেজনাতেই বার আনা স্ত্রীলোকের চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে। অসচ্চরিত্রা ঝিয়েরা সচ্চরিত্রা ঝিদিগের চরিত্র কলঙ্কিত কর্‌বার আবার প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকে। সচ্চরিত্রা ঝি তাহাদের প্রাণে সহ্য হয় না, সকলকেই তারা আপনাদিগের দলে টান্‌বার চেষ্টা করে থাকে। অনেক হতভাগিনীই তাহাদের সংসর্গে পড়ে অমূল্য চরিত্ররত্ন হারায়।"

সুরবালা।—তোমার কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। এইজন্যেই তুমি কি অন্যান্য ঝির সঙ্গে মিশ্‌তে আমাদের ঝিকে বারণ কর্‌তে? আমি কিন্তু তখন সে কথা বুঝ্‌তে পারিনি। যদি সে সময় একটু সাবধান হতুম্, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের ঝির অদৃষ্টে এ দুর্দ্দশা ঘট্‌ত না।

আবার ঝির প্রতি সহানুভূতি! কেবল সহানুভূতি নয়, তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন! এই যে সুরবালা রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছিল, এখন তাহার সে রাগ কোথায় গেল? আমি সুরবালা-চরিত্রের সকল অংশ বুঝিতে পারি, কিন্তু এই অংশ বুঝিতে পারি না। তোমরা কেহ আমায় বুঝাইয়া দিতে পার? সুরবালার যাহাতে অশ্রুবিসর্জ্জন হয়, সে কথা বুঝিতে গেলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়। আমি কিন্তু সে কথার আর আলোচনা করিব কিরূপ? কোন একটা কাজ উপলক্ষ করিয়া আমায় তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিতে হইল।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। ঝির কথা আর আমার মনে নাই; সুরবালাও এখন সে কথা আর উল্লেখ করে না। একদিন প্রাতে আমি গঙ্গাস্নান গিয়াছি, এরূপ গঙ্গাস্নান মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমি যাইতাম। সে দিন রবিবার, সুতরাং সন্ধ্যা-আহ্নিক গঙ্গার ঘাটেই শেষ করিয়া আমি সূর্য্যপ্রণাম করিতে গিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক নিলর্জ্জভাবে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র সে এরূপ কদর্য্য হাসি হাসিল যে, সে হাসি দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অনেক ভদ্রলোকের স্ত্রীলোক সেখানে স্নান করিতেছিল; সুতরাং সেই স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রবংশীয়া ভাবিয়া আমি যেন ঘৃণায় ও লজ্জায় মরিয়া গেলাম। সেদিকে আর চাহিলাম না, সে ঘৃণিত হাসি আর দেখিলাম না। কিন্তু এই সময় কর্ণে শুনিলাম,—"একবার চেয়েই না হয় দেখ, দেখ্‌লে কিছু আর জাত যায় না।"

সে স্ত্রীলোক আমার অপরিচিত বটে, কিন্তু তাহার কণ্ঠের স্বর আমার বেস্‌ পরিচিত। আমি বিস্ময়ে সেইদিকে পুনরায় চাহিয়া

ফেলিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম কি? আবার কি দেখিব? সেই আমাদের ঝি!



দশম পরিচ্ছেদ।

হাঁ—আমাদের ঝি! প্রথম চিনিতে পারি নাই, কিন্তু এইবার চাহিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম যে, সে স্ত্রীলোক আর কেহ নহে, আমাদের সেই ঝি। কেন চিনিতে পারি নাই, বলি শুন। এখন সে ঝিকে আর চেনা যায় না। সে এখন হারা, যে সব অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধান করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে এখন চিনিতে পারাও সহজ নহে। সে বেশভূষা ও অলঙ্কারে তাহার আকার ও বর্ণগত অনেক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইয়াছিল। আর ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক ভাবিয়া ত আমি তাহাকে ভাল করিয়াও দেখিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, হঠাৎ পথমধ্যে কোন ভয়ানক হিংস্রজন্তু দেখিলে পথিকের প্রাণ যেরূপ আকুল হইয়া উঠে, আমারও মন সেইরূপ আকুল হইয়া উঠিল। আমি একটা হাসির ধ্বনি শুনিতে শুনিতে দৌড়িলাম। সে হাসি একজনের হাসি নয়, সে অনেক-গুলি স্ত্রীলোকের ঐক্যতান হাসি। তবে কি যে সকল স্ত্রীলোককে আমি ভদ্রবংশীয়া মনে করিয়াছিলাম, সে স্ত্রীলোকেরা ভদ্র-বংশীয়া নহে? তাহাদের মধ্যে দুই এক জন যে আমাদের ঝির সঙ্গী ছিল, তাহা আমি সেই হাসির ধ্বনিতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা যে দল বাঁধিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকে, তাহার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? সে উদ্দেশ্য কি পতিতপাবনী-স্পর্শে মুক্তিলাভ? সমস্ত রাত্রি পাপাচরণ করিয়া প্রাতে সেই সকল পাপ হইতে

উদ্ধার হইবে বলিয়া কি এই সকল পাপিয়সী গঙ্গাস্নানে আসে? না—তাহা নহে। এই সকল হতভাগিনীর আবার উদ্ধার আছে নাকি? তবে কি মা ভাগীরথীর এতদূর পবিত্রতা নাই যে, এই সকল পাপীয়সীকে উদ্ধার করেন? একথা হিন্দুর প্রাণে সহ্য হইতে পারে না; ইহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক পাপী হইলেও জাহ্নবীজলস্পর্শ-মাত্রই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহারা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিলেও অনন্তকাল মধ্যে উদ্ধার পাইবে না। তাহার কারণ, কেবল পাপী হইলেই হয় না, উদ্ধারের মন ও বিশ্বাস চাই। কিন্তু ইহাদের সে মন ও বিশ্বাস কোথায়?

সে মন ও বিশ্বাস দূরে থাকুক, ইহাদের গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যই কেবল পাপাচরণ! ইহাদের পাপ-ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্যই ইহারা গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকে। কি! পাপ-ব্যবসার জন্যই গঙ্গাস্নান! ধরিত্রী এত পাপাচরণও সহ্য করিয়া থাকেন? ধন্য মা জাহ্নবী তোমার পবিত্রতা! আর ধন্য মা ধরিত্রী তোমার সহগুণ!

আমি এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এ ঘাটে আর কখন গঙ্গা-স্নানে আসিব না। গৃহে আসিলেই সুরবালার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তখন আজিকার ঘটনার বিষয় সুরবালাকে বলিব কি না, এই কথা আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। সুর-বালার নিকট আমার মনের কোন কথা আমি গোপন করিয়া রাখিতে পারিব না, অথচ একথা সুরবালাকে বলিলেই তাহার প্রফুল্লমুখ বিষন্ন হইয়া যাইবে। অনেকক্ষণ আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর আর থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ

বলিলাম,—"সুরবালা, আজ আবার এক বিপদে পড়েছিলুম।"

সুরবালা আগ্রহের সহিত বলিল,—"কি বিপদ! কোথায় বিপদে পড়েছিলে?"

আমি।—আজ গঙ্গাস্নানে গিয়ে বিপদে পড়েছিলুম!

সুরবালা।—কেন, তুমি ত সাঁতার জান।

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম,—"যে সাঁতার জানে, তার কি কোন বিপদ হয় না সুরবালা?"

সুরবালা।—তবে হাঙ্গর-কুমীরের হাতে পড়েছিলে না কি?

আমি।—সে হাঙ্গর-কুমীরের হাতে পড়া অপেক্ষাও ভয়ানক বিপদ! আমি যার হাতে পড়েছিলেম, সে হাঙ্গর অপেক্ষাও ভয়ানক হিংস্র।

আমার কথায় সুরবালার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, আমি তাহার মুখের ছবিতে তাহার প্রাণের সে ভাব বুঝিতে পারিলাম। তাহার মুখখানি যেন একখানি দর্পণ, সেই দর্পণে যেন তাহার প্রাণের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। আমি তখন বলিলাম,—"সুরবালা, গঙ্গাস্নান করতে গেলে, আর কি কোন বিপদ হয় না!"

সুরবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার ভয় আছে।"

আমি।—সে বিপদ নয় সুরবালা, আজ আমি আবার সেই হতভাগিনীকে দেখিয়াছি।

সুরবালা অধিকতর আগ্রহ হইয়া বলিল,—"কে সে হতভাগিনী?"

তখন হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল,—"আমাদের ঝি।"

মাসিক উপন্যাস।] মাঘ, ১৩০০। [দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

সমস্যা।

(সমস্যাপূর্ণ [illegible]াস।)

অধীন-প্রণীত।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,

প্রকাশক,

'অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়, ৮নং টমাস লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।

৯৪।১নং লোয়ার সারকুলার রোড, অন্নপূর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
শ্রীবেণীমাধব ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।
কলিকাতা।



সমস্যা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"না—না, এও কি হ'তে পারে?"

"হাঁ—এই-ই বটে।"

"যাক—যাক, আর তামাসায় দরকার নেই। এখন, কি কি সব দেখে এলে, বল দেখি?"

"আমি কি আর মিছে বল্‌ছি? আমি স্বচক্ষে দেখেছি—তোমার দিব্যি!"

রামশরণ বাবুর বদনে বিষন্নতার রেখাপাত হইল—তিনি একটু দমিয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ আমতা-আমতা-সুরে বলিলেন,—"তোমার চিরদিনই ঐরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা স্বভাব। আমি ভেবেছিলেম, এতদিন নানা বিদেশ-বিভূঁই বেড়িয়ে এসে, তোমার কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য জন্মাবে। তা না হয়ে, এখনও তোমার সেই ভাব!"

"যাই বলুন, বাস্তবিকই আমি ঠাট্টা করছি না। আর তা'হলে এত দিব্যি-দিবাস্তরই বা করবো কেন?"

প্রফুল্লচন্দ্র এবার কিঞ্চিৎ গম্ভীর-ভাবেই কথাগুলি বলিলেন! কিন্তু রামশরণ বাবুর তবুও বিশ্বাস হয় না; তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যি বল্‌ছ—আমার দিব্যি।"

প্রফুল্লচন্দ্র কিঞ্চিৎ ক্রোধভরে উত্তর করিলেন,—"বলছি তো বটেই, তবে আপনার বিশ্বাস! তা' যাক—ও সব কথা ছেড়ে দেন—আমি না হয় মিথ্যেই বলেছি?"

"না—না, তা কেন? তবে বলছি কিনা—কি কি রকমটা দেখে এলে, তাই—তাই—"

রামশরণ বাবুর কণ্ঠস্বর আপনা-আপনিই রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্রফুল্লচন্দ্র অনেক ইতস্ততের পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"ভিড়ের কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি। ঘাটের কিনারাটা প্রায় আধ-কোশ নিয়ে, যেন লোকে ছেয়ে ফেলেছে—কেবল মাথা, কেবল মাথা, কেবল মাথা। কে কারে দেখে?—কে কার খোঁজ নেয়? সোমবার দিন বেলা দু'পুরের পর হ'তেই সব জাহাজ ছাড়তে আরম্ভ হয়; লোক বোঝাই হয়, আর এক-একখানা জাহাজ ছেড়ে চলে যায়। এত লোকের ভিড় যে, আমরা হেন ষণ্ডামার্কের দলও, বেলা দু'পুর থেকে চেষ্টা করেও সে ভিড় ঠেলে, অনেক কষ্টে, সন্ধ্যার সময়ের শেষ-জাহাজখানা ধর্‌তে পেরেছিলেম। লোকে জাহাজ-খানা যেন ডুবুডুবু! কাপ্তেন কিছুতেই আর লোক নিলে না; খালাসিরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল,—'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর; কাল আবার দোসরা জাহাজ আসবে, তা'তেই তোমরা যেতে পাবে।' লোকজনের কি হাহাকার—কি আর্ত্ত-

নাদ! কিন্তু আর উপায় কি?—জাহাজ ছাড়িয়া দিল! আমি জাহাজের পিছন-দিকেই পড়িয়া ছিলাম, সুতরাং লোকগুলোর জাহাজে উঠিবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি অনেকটাই আমি দেখিয়াছিলাম। সেই সময় বোধ হইল, সেই দুইটি স্ত্রীলোক—অবশ্য দূর হইতে দেখা—ঠিক তাঁরা কিনা কি করিয়া বলিব—যেন জাহাজের দিক থেকে বিষণ্ণ-মনে ফিরে গেলেন। তা' তাঁরা নাও হ'তে পারেন!"

"তবে তারা কখনই নয়। আমি রইলাম এখানে—আমার মত না নিয়ে, তারা কি কখনও এমন অসম-সাহসিক কাজ কর্‌তে পারে? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌ছি,—না—তারা কখনও হতেই পারে না। তারা আমার এমন অবাধ্য নয় যে, আমার অমতে বাড়ীর বা'র হ'বে। সাধ্য কি তাদের? বিশেষ, টাকা-কড়িই বা তারা কোথায় পাবে—আমি না দিলে?"

"তা' ঈশ্বর করুন—নাই হোন তাঁরা। আমার দেখারই ভুল হোক। আর অত দূর থেকে দেখা—ভুল হওয়ারই সম্ভাবনা।"

"তা' তাই-ই হবে।"

বাহিরে ঈষদ্ মৃদু-হাস্যের সহিত রামশরণ বাবু এইরূপ উত্তর দিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রও অগত্যা উত্তর করিলেন,—"তা তাই-ই হবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাঠের পর প্রকাণ্ড মাঠ, জঙ্গলের পর নিবিড় জঙ্গল—এইরূপ কতই অতিক্রম করিতে হয়। পথে কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি, তাহার ইয়ত্তা নাই। দূর—দূরান্তরে এক একটী চটি—চটিতে না মিলে খাদ্যদ্রব্য, না মিলে শয়নের স্থান। তবে চটিদার-মহাপ্রভুদিগের কৃপায় কোথাও চোর-ডাকাইত-ঠেঙাড়ে-গণের প্রতিপোষণের অভাব নাই। এরূপ সংবাদ প্রায়ই শুনা যায়—আজ অমুক চটিতে ডাকাইত পড়িয়া যাত্রীদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, কাল অমুক রাস্তায় কয়েকটা মানুষের মুণ্ডু গড়াগড়ি যাইতেছে।

একটী প্রকাণ্ড মাঠের পর, বড় বড় গোটা-দুই-তিন বট-গাছের তলায় কাতলামারির চটি। এই চটিতে সপ্তাহে শনি-মঙ্গলবার এই দু'দিন হাট বসিয়া থাকে। হাটের একধারে একখানি খড়ের ছাওয়া ঘর—তাহার দাওয়ায় একখানি মুদির দোকান। হাটবারে আর আর যে সব দোকান-পাট বসে, সে সব সেই বটগাছতলাতেই বসিয়া থাকে। নিজ কাতলামারী গ্রাম অবশ্য ঐই চটি হইতে প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ। তবে দূর মাঠের মধ্যে এইরূপ হাট ও ঐ মুদীর দোকানখানি রাখার অভিপ্রায়ই এই যে, উহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যস্থলে এবং যাত্রিগণের যাতায়াতের পথে অবস্থিত—যাত্রীদের

ঐইখানেই বিশ্রামাহার করিবার সুবিধা হয়। সন্ধ্যা হয়-হয়—এমন সময়ে, অনেক কষ্টে, কতকগুলি যাত্রী এই চটিতে আসিয়া পৌঁছিল।

মুদী, গাছতলায় একখানা মাদুরে বসিয়া, পাখীকে পড়াইতেছে—"পড় বাবা আত্মারাম—পড়—রাম রাম।"

মুদিনীও, সেদিনের মত দোকান-পাট সারিয়া, গালভরা একটা পান মুখে পুরিয়া, চুন ও দোক্তা হাতে করিয়া, মুদীর পাখীপড়ানয় গুরুগিরি করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়, যাত্রীদের দলপতি ডাকিল,—"কৈ হে, দোকানদার কোথায়? যায়গা-টায়গা আছে?"

মুদী ও মুদিনীর হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। মুদী, তাকাইয়া দেখিয়া, বলিল,—"ওঃ! এই কয় জন লোক আপনারা—তারই এত হাঁক-ডাক। দু'শো পাঁচশো লোকের যায়গা পড়ে আছে; তার আর ভাবনা কি?"

যাত্রীরা বলিল,—"কৈ? ঐ তো তোমার একখানি ঘর—এত লোকের যায়গা কোথায় দেবে?"

মুদী একটু বিরক্তি-স্বরে উত্তর দিল,—"তা তো বটেই! এমন বড় বড় তিনটে বটগাছ, এতেও আবার যায়গার ভাবনা? এই নেও—চটা নেও—যেখানে ইচ্ছা, ব'স—শোও—যা ইচ্ছা কর। তার আর ভাবনা কি?"

যাত্রীরা আবার বলিল,—"কেন—ঘরে?"

মুদী।—ওরে আমার কুটুম্‌রা রে? আমরা শালারা তবে মরিগে যাই? ভালা আমার খদ্দের রে! যাও—যাও বাপুরা—এখানে যায়গা নেই।

যাত্রীরা।—না—না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। তা' এখানে কোন ভয়-ভীত নেই তো?

মুদী।—কোন চিন্তা নেই—আমি আছি। আমার নাম হারাধন চীনে।

যাত্রীরা আর কি করিবে, উপায় নাই, অগত্যা সেইখানেই রাত্রি কাটাইতে বাধ্য হইল। মুদী বলিয়া দিল,—"তা' ইহাতে আপনাদের সুবিধা বৈ অসুবিধা হইবে না। ভাড়া জনাজত একপয়সা করেই দেবেন এখন।"

রাত্রিকাল, অগত্যা যাত্রীরা তাহাতেই স্বীকৃত। কেহ বা সে রাত্রিতে মুদীর দোকান হইতে কিনিয়া দুই-এক পয়সার চিড়া-গুড় খাইয়াই শয়ন করিলেন; কেহ বা একেবারেই নিদ্রা-দেবীর আরাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। যাত্রিদলের অভিভাবক-গণ, চারিদিকে মশাল জ্বালিয়া সেই বৃক্ষতলেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

* * *

ইতিমধ্যে এ কি বিষম দুর্দ্দৈব! যাত্রিদলের সঙ্গে শ্রীধাম পুরুষোত্তম হইতে দুইটি স্ত্রীলোক সঙ্গ লইয়াছিল—দেব-দর্শন করিয়া তাহারাও দেশে ফিরিতেছে। রাত্রি-শেষে তাহাদেরই এক জনের বিষম ওলাউঠা! যাত্রীরা তাহাদের বিশেষ পরিচয় আর কিছু জানিত না, বা জানিবার জন্য চেষ্টাও পায় নাই। কেবল এইমাত্র জানিয়াছিল—তাহারা দুই ননদ-ভাজ, দুই জনেই তীর্থযাত্রায় আসিয়াছিল; আসিবার সময়কার সঙ্গীদের হারাইয়াছে, তাই তাহাদের সঙ্গে যাইতে চায়। দলের অধি-কারী, সৎব্যক্তি বলিয়াই হউন, বা তাঁহার অপর কি অভিপ্রায়

ছিল তাহা ভগবানই জানেন, তিনি ঐ স্ত্রীলোক দু'টীকে সঙ্গে লন ও দেশে পৌঁছাইয়া দিবার ভরসা দেন। স্ত্রীলোক-দু'টী তাই শ্রীধাম হইতে এযাবৎ তাঁহাদের সহিত আসিতে-ছিল। পথিমধ্যে এই বিপদ!

যে স্ত্রীলোকটীর এইরূপ ব্যায়ারাম, সে ভাজ—তাহার নাম বলিয়াছিল—নীরদা। ননদিনীর নাম—শ্যামা। নীরদার বয়স আন্দাজ ২৫। ৩০ বৎসর; শ্যামারও তদ্রূপই—তফাৎ দু' এক বছর এদিক, আর ওদিক। দুই জনেই দেখিতে সুশ্রী। শ্যামা বিধবা—শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতায় আসিবার সময় ঢাকার পথে নৌকা-ডুবিতে তাহার স্বামী মারা পড়েন। নীরদার কিন্তু এখনও সধবা-চিহ্ন বর্ত্তমান।

তিন বার বমন, তিন বার ভেদ! নীরদার বাক্য বন্ধ, চক্ষু কোটরস্থ, হাত-পা অবশ। অধিকারী হতাশ হইলেন, শ্যামাও হতাশ হইল; দলের অপরাপর যাত্রীদের যিনি যিনি খোঁজ-খবর লইতেছিলেন, তাঁহারাও হতাশ হইলেন। এদিকে ক্রমে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল।

অধিকারী বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। কালতামারীর চটি হইতে চৌদ্দ ক্রোশ এক মাঠ, তার পর গড়-সমুদ্রপুর গ্রাম; মধ্যে মাঠ—ধূ ধূ—আর জনপ্রাণীর স্থান নাই। খুব রাত্রি থাকিতে বাহির না হইলে, এই লটবহর লইয়া দিনমানের মধ্যে সেখানে পৌঁছান যায় না! পথেও বিষম ঠেঙাড়ের উপদ্রব—একটু আঁধার পড়িলেই, আর নিস্তার নাই। অধিকারী ভাবিতে লাগিলেন,—"তবে উপায় কি? থাকিতে গেলে, এক দিন মাটি হয়; অত যাত্রীর এক দিনের খরচা কত? বিশেষ, সক-

লেরই সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তার পর, থাকিলেই বা ফল কি?—উহার তো বাঁচিবার আশা কিছুই নাই! উহার সংকারই বা কে করিবে, আর সে সংকারের খরচাই বা কে দিবে?" এইরূপ নানা বিপদাশঙ্কায়, অধিকারী, দলের আরও দুই-এক জনের মত জানিতে চাহিলেন। কেহ আবার বলিল,—"অত কেন? ও থাক এখানে পড়ে; আমরা ততক্ষণ এগিয়ে যাই। মুদী বেটাও যেন না জান্‌তে পারে! জান্‌লে, আরও বিপদ ঘট্‌বে। বিশেষ, অজানা-অঘরের স্ত্রীলোক—কে ওর খোঁজ-খবর দেবে?"

অগত্যা সেই রাত্রেই সায় হইল। অতি প্রত্যূষে, মুদীকে আর না জাগাইয়া, তাঁহাদের প্রস্থান করাই স্থির হইল। পূর্ব্ব-রাত্রেও মুদীকে ঐরূপই বলা ছিল যে, ভোরেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন; এবং সেইহেতু তাহার প্রাপ্য গণ্ডাও চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন, তাহারই উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ওদিকে স্ত্রীলোকটীর মুমূর্ষু অবস্থা, এদিকে যাত্রাদের পলায়ন-উদ্যোগ!

শ্যামা কিন্তু বড়ই ফাঁপরে পড়িল। এ অবস্থায় একাকিনী স্ত্রীলোক—সেই বা কি করে? একবার তার দাদার কথা মনে পড়িল; ভাবিল,—"কি বলিয়া দাদাকে জবাব দিব?" আবার ভাবিল,—"মা যখন বলিবেন—নীরদাকে কোথায় রেখে এলি, তাঁকেই বা কি বলিব?" এইরূপ কত কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। নীরদা যে সর্ব্বদা তাহাকে আপনার ভগিনীর মত স্নেহ-যত্ন করিয়াছে, সেও যে নীরদাকে বরাবর কনিষ্ঠার মতই দেখিয়া আসিয়াছে, আর একমাত্র

রই পরামর্শ-ভরসায় নীরদা যে এই তীর্থযাত্রায় আসিয়াছে, একে একে এই সব কথাই তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। শ্যামার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শ্যামার এমনও মনে হইতে লাগিল,—"হায়! বউ না মরিয়া আমি অভাগীই কেন মরিলাম না? আমার তো সব সাধই ফুরিয়েছে; আমার আর বেঁচে ফল কি? লোকের যে ভরা-ডুবি হয় বলে, আমার সত্যিসত্যিই তাই হয়ে গিয়েছে; বউকে না নিয়ে, ভগবান কেন আমায় নিলেন না?"

গৃহে আগুন লাগিলে, সঙ্গে সঙ্গে পবনদেবও আসিয়া তাহাতে যোগ দেন। শ্যামার মনেও এখন, স্বামীর শোক উথলিয়া উঠিতে লাগিল; বাড়ী থেকে তাঁর বিবাগী হ'য়ে বেড়িয়ে আসা পদ্মার পথে নৌকা-ডুবিতে মারা-পড়া—ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামা এইরূপ কত কি ভাবিতেছে, ইতিমধ্যেই যাত্রীরা ডাকিল,—"চল, চল; আর দেরি করো-না কেউ।"

শ্যামা চমকিয়া উঠিল। শ্যামা তবে কি করিবে? শ্যামা বিষম ভাবনায় পড়িল। আর যে সময়ও নাই! যাত্রীরা যে চলিল!

"শ্যামা! শ্যামা!"

ডাকের উপর ডাক! শ্যামা আর স্থির থাকিতে পারিল না। শ্যামার সকল ভাবনা—সকল চিন্তা দূরে গেল; শ্যামা ভাবিল,—"এ বিজনে আমি একলা কি করে থাকি?" শ্যামার মনে বড় ভয় হইল। শ্যামা, ধীরে ধীরে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, অগত্যা যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গেই দুই-এক পা অগ্রসর হইল।

কিন্তু এ কি?—শ্যামা আবার ফেরে কেন? মশালের

আলোয় নীরদার ম্লানমুখ। শ্যামার চক্ষে আবার প্রতিভাত হইল; শ্যামা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"বউ—বউ! না—না, তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যা'বো?"

শ্যামা আবার ফিরিল।

যাত্রীরা ডাকিল,—"শ্যামা—শ্যামা! কোথায় যাও? মরার সঙ্গে তুমিও কি মর্‌তে চাও? বিশেষ এ চোয়াড়ের দেশ—শেষে কি জাতধর্ম্মও খোয়াবে? ফের—ফের।"

দলপতি শ্যামার হস্ত ধারণ করিয়া শ্যামাকে ফিরাইলেন। শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ফিরিল—আবার চলিল। কিন্তু কেন চলিল, কোথায় চলিল, শ্যামা আর তাহার কিছুই চিন্তা করিল না—চিন্তা করিতে অবসরও পাইল না—শ্যামা চলিল।

আর নীরদা? নীরদা সেইখানে সেই মুমূর্ষ-শয্যায় পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় এক মাস হইতে বৃদ্ধার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ। বৃদ্ধা সদাই ভাবে,—"কেন তাদের যেতে দিলেম, যেতে দিলেম তো পত্র লিখে ছেলের মত নিলেম না কেন? একথা সে শুন্‌লে কি ভাব্‌বে—কি বল্‌বে?" বৃদ্ধা কখনও সত্যনারায়ণের সিন্নি-মানত করে,—"ঠাকুর! সুভালাভালি তা'দের ঘরে এনে দেও, আমার মুখ বজায় থাকুক।" কখনও পীর-পয়গম্বরের

নিকট ঘোড়া মানসিক দেয়; কখনও বা, মনের বেশী উদ্বেগ উপস্থিত হইলে, মা-কালীর নামে ঘোড়া-পাঁঠা মানত করে।

এমনই আবেগ-উদ্বেগে বৃদ্ধার দিন কাটে। বৃদ্ধা সদাই রাস্তার দিকে হা করিয়া চাহিয়া দেখে—ঐ বুঝি কা'রা আসিতেছে। অন্যমনস্কে আছে; দূরে পত্র-মর্ম্মর হইল; অমনি বৃদ্ধা চমকিয়া মনে করে—বুঝি যাত্রীদের পদশব্দ। কেহ কোন কথাবার্ত্তা কহিলে, বৃদ্ধা ভাবে—বুঝি তাহাদেরই কথা-বার্ত্তা হইতেছে; অন্যমনে অমনি জিজ্ঞাসা করে—তাহারা কি আসিয়াছে?

গ্রামের আর আর যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর মাটী তো আর থাকে না! দিন নাই, রাত্রি নাই, যখনই সে কথা মনে উদয় হয়, তখনই গিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করে,—"হাঁ গো! কোন খোঁজ-খবর পেয়েছ কি?"

ক্রমে গ্রামের অপরাপর সকলেও ফিরিল। কিন্তু তাহারা কোথায়? বৃদ্ধা আরও উদ্বিগ্ন হইল; প্রত্যেকেরই বাড়ী বাড়ী গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তোমরা এলে, কৈ—তারা কৈ?" উত্তরও সঠিক মিলে না। যাইবার সময় যিনি বড়ই সাহস দিয়াছিলেন,—"আমরা যখন আছি, ভয় কি—স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারেন, শীগ্গীরই ফিরে আস্‌বো—কোন চিন্তা নাই;" এক্ষেত্রে তাঁহাদেরও রা বন্ধ। বড় জোর কেহ বলিলেন,—"তাহারা পশ্চাতে আসিতেছে।" কেহ বা বিস্ময় দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন—তাদের তো আমাদের আগেই আস্‌বার কথা!" তবে যাহারা নিতান্ত সত্যবাদী, তাহারা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল,—"তা' দিদি-মা, দুঃখ ক'রে আর কি

হবে? বুড়োবয়সে তোমার এ অদৃষ্টের দুঃখ, কে খণ্ডাবে বল? বেটার কুমীর ত নয়—যেন সাক্ষাৎ যম! আহা! ছুঁড়িছুঁটো সবে-মাত্র ঘাটের ধারে পৌঁছেছে, আর কোথা থেকে এসে পড়ে, লেজের ঝাপ্‌টা দিয়ে একেবারে ডুবিয়ে নিয়ে গেল? নিয়তি গো নিয়তি! নইলে, এত লোকের মাঝখান থেকে, তাদেরই বা নেবে কেন?"

কেহ বা উহারও উপর একমাত্রা চড়াইয়া সুর ধরিল,—"শুধু কি নেওয়া?—নেওয়া, আর গিলে ফেলা! একদণ্ডও দেখ্‌তে দিলে না—দুটো দুটো মানুষ একদম গিলে ফেল্‌লো গো—গিলে ফেল্‌লো?"

বৃদ্ধা এতক্ষণ সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। এই সব নানা-মুনির নানা-ব্যাখ্যা শুনিয়া, তিনি তো দম্ খাইয়া পড়িলেন। কেহ পাখা আনিয়া বাতাস দিতে লাগিল; কেহ নাকে-মুখে-চোকে জলসেক করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত দুই-এক জন, বৃদ্ধাকে যেন ভোগা দিয়া বলিতে লাগিল,—"না দিদিমা, তা নয়—তা নয়! তাঁদের কুমীরে নেয়-নি গো—কুমীরে নেয়-নি! আমরাও তো সে সঙ্গে ছিলেম; আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁরা জাহাজ ধর্‌তে পারেন-নি, তাই পিছিয়ে পড়েছেন। মেলা লোকের ভিড়, জাহাজে লোক আর ধরে না; তাই জাহাজ তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল—তাঁরা আর'সে জাহাজে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। পরে, দোস্‌রা জাহাজ গেলে, তাঁরা আস্‌বেন। কোন চিন্তা নেই দিদিমা, কোন চিন্তা নেই।"

নস্ত্রোত্থিত রোগীর ন্যায়, বৃদ্ধা ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া

উঠিল,—"তোরা সত্যি বল্‌ছিস্ তো? তারা তো প্রাণে বেঁচে আছে? তাদের দেখা তবে পাবো?"

"হাঁ দিদি-মা, হাঁ!—আমরা সত্যিই বল্‌ছি।' আমরা আগে থেকে জাহাজে উঠে বসেছিলেম; আমরা ঠিক দেখেছি, তাঁরা উঠ্‌তে পারেন-নি; যাঁরা কুমীরে খাওয়ার কথা রাষ্ট্র করছেন, তাঁরা কি আর কিছু দেখ্‌বার অবসর পেয়েছেন? তাঁ'দের নিজেদেরই আর একটু হ'লে সেই দশা হ'তো; তা' তাঁরা আর পরের খোঁজ রাখ্‌বেন কি?"

"সত্যি—সত্যি বল্‌ছিস্? আহা! বেঁচে থাক বাছারা—বেঁচে থাক! তারা তবে আস্‌বে?—আস্‌বে?

"আস্‌বে দিদিমা, আস্‌বে। কোন ভাবনা নেই।"

"আস্‌বে!—আস্‌বে? কিন্তু—আর কবে আস্‌বে? আরও পরে এলে, ছেলে যদি জান্‌তে পারে।"

বৃদ্ধার আবারও সেই আবল্য—সেই একই ভাবনা—"ছেলে যদি জান্‌তে পারে!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"বুঝ্‌লি তো!"

"হাঁ!"

"মনে থাক্‌বে তো?"

"থাক্‌বে!"

"তা'হলে ঠিক বাড়ী পৌঁছে দেবো।"

"তা' তাই-ই বল্‌বো।"

"নইলে, এ চোয়াড়ের দেশ; সাদা পথে, এদেশ থেকে জাত-কুল বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া বড় শক্ত। বুঝ্‌লি কি না?"

"বুঝেছি।"

"তোর নাম কি?"

(অন্যমনস্কে) "নীরদা!"

"তবেই হয়েছে; তুই সবই বুঝেছিস্‌! এত ক'রে শিখিয়ে তার এই ফল!"

(সলজ্জভাবে) "না—না, ভুল হয়েছে—হীরেমণি।"

"বাপের নাম?"

"ওটা আর কেন জিজ্ঞেসা কর? ওটা কি বদলান যায়?"

"তবেই হয়েছে। তবে থাক তুই এখানে—যা' ইচ্ছে কর। আমি চল্লেম—"

"চটেন কেন? বলছি—বলছি।"

একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, অপর একটী যুবতীকে এইরূপে নামকরণ শিখাইতেছে। শিক্ষাচ্ছলে কখনও চোখ রাঙাইতেছে, কখনও মিষ্ট বলিতেছে, কখনও ভয় দেখাইতেছে, কখনও বা একদম্ স্বর্গে তুলিতেছে। মাঝে মাঝে, পরীক্ষা-চ্ছলে, প্রশ্নগুলি পরপর পরতাল দিয়াও লওয়া হইতেছে।

হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সংসারে তোর আর আপনার বলবার কেউ আছে?"

যুবতী এবারও অন্যমনস্কে ছিল; কাঁদিয়া ফেলিল,—

"আমার যে সকলই আছে! অমন দেবতার মতন স্বামী, কৌশল্যার মতন শাশুড়ী—"

"আরে ম'লো য়া! আমি কি এতক্ষণ এই কাঁদুনী কাঁদ্‌তে শিখালেম? আমি বল্‌লেম,—বলবি—'আমার আপনার লোক আর কেউ নেই। তা না, এ আবার কি ঢং।"

"ওগো! না—না, আমায় আর না বলাবে, আমি সব বল্‌তে পারবো; কিন্তু তাঁদের অমঙ্গল—আমি প্রাণ থাক্‌তে—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; অলক্ষিতে অশ্রুজলে যুবতীর বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

প্রৌঢ়া, বেগতিক বুঝিয়া, সান্ত্বনা আরম্ভ করিল। বলিল,—"বাছা, অমন অবোধের মত হলে চলবে কেন? আমি তোমার মন্দের চেষ্টা করছি, না ভালর জন্যই এমন করছি? ভাব দেখি, যে অবস্থায় তোমায় সবাই ফেলে রেখে গিয়েছিলো, আমি যদি না দেখ্‌তেম, তা'হলে তোমার কি দশা হ'ত? শেয়াল-কুকুরেই যে টেনে খেতো? বিদেশ-বিভুঁয়ে অজানা-অপরিচিত লোকে—এতটা কে কার করে থাকে বল দেখি? এতটা করে বাঁচিয়েছি বলেই, আমার একটা মায়া হয়েছে; আর সেই মায়ার বশেই তোমায় বাড়ী পৌছে দিতে চেষ্টা হচ্ছে। তা' এতেও যদি তুমি আমার কথা না শোন, তবে আর কি বলবো?"

সান্ত্বনার সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়া কিঞ্চিৎ অভিমানও প্রকাশ করিল। অবলার সরল হৃদয়—কতক্ষণ সে বেগ ধারণ করিতে পারে? যুবতী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল,—"ও সব কথা মনে করতে গেলে, আপনা-আপনিই যে কান্না আসে—তা আমি কি করবো?"

"কচি খুকী তো আর তুমি নও এখন, যে তোমাকে বুঝিয়ে মানুষ কর্‌বো? নিজের ভাল নিজে যদি না বোঝ, কে আর বোঝাতে পারে?"—কিঞ্চিৎ দুঃখের ভান প্রকাশ করিয়া, প্রৌঢ়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আপনা-আপনি বলিল,—"হায়! ধর্ম্মই যদি রক্ষা করতে না পারলেম, তবে আর কেন সে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচালেম?"

সহানুভূতিতে প্রাণকে যতটা অভিভূত করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। যুবতী এবার যেন দ্বিগুণ উৎসাহে বলিল,—"আর দুঃখ ক'রো না; আমি তাই-ই বল্‌বো। যা' যা' শিখিয়ে দেবেন, তার একবিন্দুও নড়-চড় হবে না। যে যায়গায় যে যে কথা বল্‌তে হবে, আমি ঠিকই বল্‌বো। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি—এর আর ব্যত্যয় হবে না। তবে তুমি যেন ছেড়ো না।"

"পাগলী! আমি কি তোর তেমন মা? তোর প্রাণ আমার প্রাণ কি ভিন্ন?"—এই বলিয়া, প্রৌঢ়া যুবতীকে সাদর-চুম্বন করিলেন। যুবতীও আদরে যেন গলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পত্রের উপর পত্র—এইরূপ কত পত্রই দেওয়া হইল। স্ত্রীর নামে লিখিলেন, ভগ্নীর নামে লিখিলেন, অবশেষে মার নামেও লিখিলেন। কিন্তু উত্তর নাই! বাস্তবিকই কোন বিপদ-আপদ

ঘট্‌লো নাকি? চিঠি লিখিলে, ভগিনীও লিখিতে পারিত, স্ত্রীও লিখিতে পারিত! তবে কেন এমন হয়? রামশরণ বাবু বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। ইহার উপর সময় সময় আবার প্রফুল্লচন্দ্রর কথাগুলি বিদ্যুদ্বৎ মনোমধ্যে চমকাইয়া উঠায়, তিনি আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। এক এক সময় মনোমধ্যে এখনও আন্দোলন হইতে লাগিল,—"তবে কি প্রফুল্লর কথাই ঠিক? তবে কি প্রফুল্ল পুরীর ঘাটে যে যাত্রীদের দেখিয়াছিল, তাহারাই আমার ভগিনী ও পরিবার হইবে?—আমায় লুকাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে গিয়াছে?" পরক্ষণেই অমনি স্নেহমমতা-ভালবাসা-আদি মনের বৃত্তিনিচয়, সে সন্দেহান্দোলনে অন্তরায় হইল; মনে হইল,—"না-না, তাও কি হতে পারে? তা'রা কি আমার এত অবাধ্য হ'তে পারে? আর, তাহলে, মাই বা কোথায়? মাকে তো সে দেখেনি! তারা গেলে, মাকে কি কখনও ফেলে যেতে পারে? আর মাই বা তা থাক্‌বেন কেন? মা সঙ্গে গেলে, মাকে নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পেতো! আর তারা লুকিয়েও যদি গিয়ে থাকে—এমন হয়, মা নিশ্চয়ই সংবাদ দিতেন। তবে কখনই তা নয়।"

এইরূপ নানা দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তাতেই দিন কাটে। কিন্তু একটা স্থিরসিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর, নিকট-সম্পর্কীয় গ্রামের দুই-একজন মুরুব্বি-পক্ষকেই পত্র লিখিয়া সংবাদ আনাইবেন—কি নিজেই একবার বাড়ী যাইয়া সব দেখিয়া-শুনিয়া আসিবেন, এমনই একটা ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইল; এবং তাহারই তোলাপাড়া

হইতে লাগিল। মনে মনে এমনই সঙ্কল্প করিলেন—"একবার আপিসে গিয়া দেখা যাক; যদি ছুটী পাই, তবে তো আর কথাই নাই; নয় তো, সেখান হইতেই অমনি পত্র পাঠাইব।"

ইতিমধ্যে ডাক-পিওন এক পত্র লইয়া উপস্থিত—"রামশরণ বাবু আছেন—রামশরণ বাবু বাসায় আছেন?"

রামশরণ বাবু সবে-মাত্র আপিসের পোষাকটী আঁটিয়া, ঝির হাত হইতে তামাকের কলিকাটী হাতে ধরিয়াছেন; এমন সময় এই ডাক!

"ঝি! দেখ্ তো—দেখ্ তো!"

বলিতেও আর বিলম্ব সহিল না; জানালা হইতে ডাক-পিওনকে দেখিয়া, কলিকাটী হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে, নিজেই ঘরের বাহির হইলেন; অভিমানে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে, হুঁকা-কলিকা গড়াগড়ি দিতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের চক্ষের জলের সহিত অভিমান-আগুনও নিবিল, বাবুও পত্র-হস্তে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঝি রাগে গিস্‌গিস্ করিতে লাগিল।

রামশরণ বাবু সেদিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া, তাড়াতাড়ি চসমাখানা একবার কোঁচার খুঁট দিয়া মুছিয়া লইলেন; পরে, দুই-তিনবার নাক-চোক টেপাটিপির পর তাহা ফিট হইয়া বসিলে, পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি কিন্তু নেহাত সেকেলে মুহুরীর খুঁট-আখুরে লেখা। কাজেই অনেক চিবাইয়া চিবাইয়া ঢোক গিলিয়া পড়িতে হইল;—

"পরম শুভাশীর্ব্বাদরাশয় সন্তু বিশেষঃ, সতত ৺ স্থানে তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্রানন্দ পরং।

পরে এ বাটীর সমাচার সমস্ত মঙ্গল; আগতে তথাকার মঙ্গলাদি লিখিবা। সংপ্রতি অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন সংবাদিতে না পাওয়ায় বড়ই ভাবিত আছি। অচিরে তোমার কুশল সংবাদ লিখিয়া সন্তোষিবা। পরে তোমার বাটী আসার কি হইল? এই সময় একবার বাটী আসিলে ভাল হইত। কারণ, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। অতএব ছুটী লইয়া সত্বর একবার বাটী আসিবা। কোন মতে যেন অন্যথা না হয়। ইতি—

আঃ—তোমার মাতাঠাকুরাণী।"

পাড়ার স্কুলের ঘড়িতে এদিকে ঢং ঢং করিয়া ১০৷৷টা বাজিয়া গেল। বাবুর আর তামাকটাও খাওয়া হইল না; মনে মনে দুর্গা-নাম জপিতে জপিতে, তাড়াতাড়ি আপিসে ছুটিলেন।

'ফিন্‌লে মুর কোম্পানীর' সদর আপিস কলিকাতায়। আপিসটা খুব বনেদী। নীল ও চায়ের ব্যবসাতেই তাহারা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। আপিসের তাঁবে অন্যূন ২৫টা নীল-কুঠী আছে; এবং ১৫।২০টা চা-বাগিচা আছে। রামশরণ বাবুর উপর তারই এক ডিপার্টমেণ্টের ভার। ঐ সকল কাজে যত কুলী-মজুর খাটে, তাহার সমস্ত হিসাব হেড-আপিসে তাঁহার দ্বারাই পাশ হইয়া থাকে। আজ তিনি একান্তই মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহার অধস্তন কোন কর্ম্মচারীর উপর দিন-কয়েকের জন্য সেই ভার দিয়া তিনি একবার সত্বর বাড়ী হইতে আসিবেন। আপিসে আসিয়া, তাড়াতাড়ি নামটা সই করিয়া রাখিয়া, আজ সেই চেষ্টাতেই ঘুরিতেছেন। আপিসেরও অনেকের তাহাতে সম্মতি পাইলেন। অতঃপর, মনে-মনে বাড়ী যাইবারই সঙ্কল্প স্থির করিয়া, তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সব মিটাইতে লাগিলেন।

কিন্তু—এ আবার কি? তুরং-চা বাগিচা হইতে কোম্পানীর বড়-সাহেব, আপিসের তদানীন্তন উর্দ্ধতন সাহেব-কর্ম্মচারীকে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাফ করিয়াছেন,—"তিন মাসের জন্য রামশরণ বাবুকে অবিলম্বে এখানে পাঠাইবে। বেতন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি। এখানকার গোলযোগ প্রায় অনেকটা নিবৃত্তি হইয়াছে; এখন রামশরণ বাবুর মত একটী ওয়াকিবহাল লোক পাইলে, সকলই বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি। কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাঁহাকে পাঠাইবে।" ঐ সঙ্গে আরও জানান হয়,—"আসিবার সময়, তিনি যেন, মেদিনীপুরের চালানী যে একদল কুলী আজকাল গোয়ালন্দে পৌঁছিবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে পাশ করিয়া জাহাজে তুলিয়া দেন। সেখানকার 'পাশিং-অফিসারকে' ডিস্‌মিস্ করিয়াছি; তৎস্থলে নূতন লোক পাঠাইয়াছি। সে লোক পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয়, সেইজন্য এই ভার তাঁহাকে দিবে।"

রামশরণ বাবু খাতাপত্র সারিতেছেন, এমন সময় সাহেব তাঁহাকে ঐ টেলিগ্রাফখানি দেখাইলেন। একবার, দুইবার—উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া—রামশরণ বাবু তিনবার টেলিগ্রাফখানা পড়িলেন। মনে অনেকটা আশা-ভরসা হইল। তাঁহার প্রতি বড় সাহেবের এমন উচ্চ ভাব, এমনটা আশা ভরসার কথা—পরিণামের এমন শুভসংঘটন—এ কি তিনি ত্যাগ করিতে পারেন?

কাজেই আর তাঁহার বাড়ী যাওয়া হইল না—সে চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করিলেন। তখন এই মর্ম্মে বাড়ীতে এক পত্র দিলেন,—"আমার জন্য কোন ভাবনা নাই; চাকরীর পক্ষে

আমার এক বিশেষ সুবিধা ঘটায় ও একেবারে পঞ্চাশ টাকা বেতন বাড়িয়া যাওয়ায়, দিন-কয়েকের জন্য আমায় একবার আসামে যাইতে হইল। সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী যাইব। কোন চিন্তা নাই। আজই আসাম রওয়ানা হইলাম। পৌঁছিয়াই সংবাদ দিব।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

“বটে ?”

“হাঁ !”

“কিছুতেই কথা শুন্‌লে না ?”

“কিছুতেই না !”

“তবেই তো !”

“তবেই তো আর কি, আমি সব খোয়ালুম—সব খোয়ালুম !”

“লোভে ভুলুতে পার্‌লে না ?”

“সে কথা আর বলিস্‌নে বোন—সে কথায় আর কাজ নেই। দু’কুড়ি দু’গণ্ডা টাকা—সব জলে গেল।”

“সে টাকা তো তোমার ওকে কিন্‌তেই গিয়েছে ! কিন্তু ওর নিজের মন-বুঝের জন্যও তো কিছু করা চাই ?”

“তারও কি আর বাকী রেখেছি ? তোফা ঘর—তোফা বিছানা—তোফা আস্‌বাব ! তা’ছাড়া, গা-ভরা গয়নাগাঁটি—

সোনার হ'ক, গিল্টির হ'ক, সে তো তা' কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চে না!"

"কি ভাবে আছে তবে এখন?"

"আমার মাথা আর মুণ্ডু! ঐ দেখ্‌না—প'ড়ে রয়েছে! না আছে সে শ্রীচাঁদ, না আছে আর কিছু! খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, নিদ্রা নেই—দিনরাতই কান্না! কথার মধ্যে কেবল—'কৈ, দাদার বাসাটা আমায় আজো চিনিয়ে দিলে না'?"

"বড় বিষম কথা দেখ্‌চি তো!"

"পোড়ারমুখী আমায় দ'য়ে মজালে! এমন বয়েসওয়ালা মেয়ে—এমন সুচেহারা—সে তুলনায় দামও অবশ্য খুবই কম; দেখে, মনে করেছিলুম—'আজ হ'তেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে।' তাই সর্ব্বস্ব ঘুচিয়েছি ওর জন্যে! নইলে, কচি-মেয়ে কিন্‌লে, এককুড়ি দেড়-কুড়িতেই হ'তো এমন। কিন্তু, এ দেখ্‌ছি আমার—সাপে ছুঁচো গেলা হ'লো।"

"আচ্ছা, কারুর্ কাছে যেতে চায় না?"

"বল্‌বো কি দুঃখের কথা, আহা প্যালা মিত্রের ছেলে—ছোঁড়ার যেমন চেহারা, তেমনি রঙ্, তেমনি বাপের পয়সা—তার সম্পূর্ণ নজর ওর দিকে; পান্নামল জহরী—সে বেটা যেন পাগল ওর জন্যে! কিন্তু, হ'লে কি হবে? সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'লো—এত যোগাড়-যন্ত্র সব ভেসে গেল!"

"আচ্ছা, কি ক'রে ওকে পেয়েছিলে?"

"সে কথা আর কি বল্‌বো—সে অনেক কথার্ কথা! তা' না হলে কি আর অমন দরে অমন একটা মেয়ে পাওয়া যায়? শুন্‌তে পাই, ওরা দুই ননদ ভাজ—বাড়ীর কর্ত্তাদের লুকিয়ে

শ্রীক্ষেত্র চলে যায়। সঙ্গে অবশ্য গাঁয়ের আরও যাত্রীরা সব ছিল। যা'বার সময় জাহাজে গিয়েছিল—যাওয়া-আসার টিকিট কিনে। আসবার সময় বড়ই ভিড়—তাড়াতাড়িতে জাহাজ ছেড়ে দেয়—সঙ্গের সাথীরা সব চলে আসে—ওরা আর উঠ্‌তে পারে না। সঙ্গে পয়সাও আর তেমন ছিল না; এদিকে হাঁটা-পথে যাত্রীরা সব আস্‌ছিল, তাদেরই সঙ্গে যুটে যায়।"

"তার পর?"

"তার পর, পথে, ওলাউঠাতে বৌটা মারা যায়। ও আর কি করে? যাত্রীদের সঙ্গেই দেশে আসে। তার পর, যাত্রী ধরা যাদের কাজ, তাদের কথা তো আর তোমার অজানিত নেই। মধ্যে থেকে, বাঁকুড়োর পথে সোনা-দিদি জুটে যায় সেও একজন পুরুষোত্তমের যাত্রী, আগের দলে আসিয়াও ঘটনাবশে দলভ্রষ্ট হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছে—এমনই পরিচয় দেয়। সোনাদিদি যেমন মিশুক—সে যেমন জহুরী, তা তো আর তোমাদের অবিদিত নেই; কাজেই সকলের পেটের কথা টেনে বার্ করে নিতে, তার আর বাকী থাকে না। লয় মাফিক, সুযোগ বুঝিয়া, সে-ই একদিন প্রস্তাব করে,—'ও রামশরণ বাবু! তাঁকে আমি চিনি! আমাদেরই বাড়ীর কাছে তাঁর বাসা। তা' আমিই তোমায় পৌঁছে দেব—চিন্তা কি? ছুঁড়ীর পক্ষে সেই-ই হ'ল কাল। তারপর যা যা' হয়েছে তা' তো তুমি শুনেছই।"

সন্ধ্যা হয়-হয় ঠিক এমনই সময়টায়, বাড়ীর ভিতরকার বারান্দায় বসিয়া, দুইটি প্রৌঢ়ায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে; এবং একজন অপরের কাছে নিজের দুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেছে

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বাহিরের দিকে তাহাদের নজর পড়িল।

"সন্ধ্যে হয়ে এলো যে! ঘরে সন্ধ্যে দিতে হ'বে—এখন তবে আসি।"

তাহাদের একজন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা, তবে এখন এস। পার তো কালও একবার এসো; দেখা যাবে—যদি কিছু করতে পারি।"

অপরা যাইতে যাইতেও যেন না বলিয়া থাকিতে পারিল না,—"দিদি! বুঝেছি, বুঝেছি; শুধু আঙুলে আর ঘি গল্‌চে না। ওকে নিয়ে আর সোজা-পথে কাজ চল্‌বে না। এখন নিজমূর্ত্তি ধরা চাই—উঠ্‌তে বস্‌তে জুতো, উঠ্‌তে বস্‌তে ঝাঁটা—তবে তো বেটী ঠিক হবে!"

"যা'হোক বোন, তোরা আছিস্ পাঁচ জন, দেখ দেখি—যদি কিছু করতে পারিস্। আমি তো হাল ছেড়েই দিয়েছি একেবারে!"

"কোন ভাবনা নেই—কাল এর বিহিত করা যাবে। আজ এখন আসি!"

"আচ্ছা, তবে এখন এস।"

প্রৌঢ়া, ভাগিনীকে বিদায় দিয়া, যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রহরাতীত। বাড়ীর বাহিরের উঠানে বসিয়া তিন-চারি জনে কি ফুস্-ফুস্ পরামর্শ করিতেছে। ভাবনার যেন অবধি নাই। প্রত্যেকেরই যেন মাতৃদায়-পিতৃদায় উপস্থিত।

বিশেষ চিন্তান্বিত-স্বরে সুপ্রবীণ শিবরাম খুড়া বলিলেন,—"নাড়ি যেরূপ পুষ্টি দেখ্ছি, এই জ্বরটায় কি হয় বল্তে পারি না। এই বেলা যা'কিছু করে নিতে পার।"

যুবক সুরেশচন্দ্রের এ কথা যেন কানে লাগিল না। সুরেশ-চন্দ্র একটু বাধা দিয়া বলিলেন,—"যে টন্‌টনে জ্ঞান—আজ-কাল যে ওর কিছু হয়, আমার তো এমনটা মনে নেয়-না!"

শিবরামের ধারণা, তাঁহার মত হাত দেখিতে পারে, এমন লোক আর এ অঞ্চলে নাই। সুতরাং কথার প্রতিবাদে মনে মনে তিনি একটু চটিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কি জান বাপু, ঐ দেখে দেখেই আমার চুল পেকে গেল। ও সব রোগে, কথা কইতে কইতে, জ্ঞান থাক্‌তে থাক্‌তেই, কাজ রফা হয়। ঐ যে পেট-ফোলা দেখ্‌ছো—ভাবনার পেট-ফোলাই বল, আর যা'ই বল—ঐ হচ্ছে কাল। এদিকে নাড়ি থাক্‌বে টন্‌টনে, কথা কইবে সজ্ঞানে, সব চল্‌বে ঠিক! কিন্তু সময় হ'য়ে এলে, ঐ পেট-ফোলার সঙ্গে সঙ্গেই, ধাঁ করে একেবারে দম-বন্ধ

হ'য়ে আস্‌বে। তখন আর শিব-সাক্ষাৎ এলেও দু'দণ্ড ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না। তোমরা সব ছেলেমানুষ; তোমরা কি জান বাপু—ঐ দেখে দেখেই আমি পেকে ঘুণ হ'য়ে গিয়েছি—বেশী আর কি বল্‌বো?"

শ্যামাচরণ ভায়া, প্রৌঢ়ের মধ্যেও আপনাকে কিঞ্চিৎ অধিক-বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করিয়া থাকেন। শিবরাম দাদার কথাটা তাঁহার বড়ই মনে ধরিল; কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হইতে না হইতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ঠাকুরদা যা বল্‌চেন, তাই-ই ঠিক! ঝাঁ করে দম্‌ আট্‌কাবে, আর বুড়ীও সিঙে ফুক্‌বে। আমার মতে, যা' থাকে অদেষ্টে, এখনই কথাটার সূচনা করা ভাল।"

বৃদ্ধার কিঞ্চিৎ নিকট-সম্পর্কীয় যুবক হলধরচন্দ্র কিন্তু সে কথায়ও বাধা দিয়া বলিল,—"যেরূপ ভাবগতিক, বুড়ি এখন কিছুতেই কিছু বল্‌চে না। সে যখন নিতান্ত বুঝ্‌বে—আর বাঁচ্‌লেম না, তখনই যদি বলে। তাও যে আরও কাউকে বলে, এমন তো মনেই ধরে না।" বলিতে বলিতে, হলধরচন্দ্র যেন ইঙ্গিতে প্রকাশ করিল, মৃত্যুকালে যা-কিছু বলিবার, বৃদ্ধা তাহাকেই বলিয়া যাইবে।

প্রবীণ শিবরাম খুড়া, কথাটা তত তলাইয়া না বুঝিলেও, উত্তর করিলেন,—"আমারও সেই ধারণা। আঁচে-ওঁচে কোন কথা তুল্‌লে, অমনি বুড়ী ব'লে ব'সে—'কোন ভয় নেই, আমার শরণকে আস্‌তে চিঠি দেও, শরণকে না দেখে আমি মরচি-নে।' ও বুঁড়ী কি আর কাউকে কিছু বলে?"

উদ্ধত সুরেশচন্দ্র আবার উত্তর করিয়া উঠিলেন,—"বলুক

আর না বলুক, চেষ্টাটা এখনই চাই। নইলে, সময় ব'য়ে গেলে, সবই বৃথা হবে।"

সুরে সুর মিলাইয়া, শ্যামারণও ঐ কথাই বলিলেন,—"আমার মতে নিদেনে উইলের একটা মুশোবিদে হ'য়ে থাক; নিতান্ত পক্ষে, নিদেন-কালে, হাতে ধরে একটা ঢেরা-সই ক'রে নিলেও হ'বে। একবার সব জিনিসপত্রগুলো তো দখলে এসে পড়ুক, তারপর তখন দেখা যাবে—কিসে কি হয়!"

প্রবীণ শিবরাম খুড়ারও অনেকটা সেই মতই হইল। তিনি অগত্যাপক্ষে বলিলেন,—"রামশরণকে না দেখা পর্য্যন্ত ও যে কিছু বল্‌বে, এতো আমার বোধ হয় না। তবে আমাদের কাজ আমরা ক'রে রাখি—এই মাত্র।"

শ্যামাচরণও তাই বলিলেন; আর বলিলেন,—"আমাকে দেখ্‌লেই কেবল বলে—'শরণকে আমার চিঠি লিখেছ তো—কৈ, সে তো এখনও এলো না!' দেখা হলে, বুড়ীর আর কোন কথা নেই—কেবল ঐ এক কথা।"

শিবরাম (সাশ্চর্য্যে)।—চিঠি কি লিখেছ নাকি?

শ্যামাচরণ।—রামও!

শিবরাম।—খবরদার—খুব সাবধান! সেটা এসে প'লে, সবদিক মাটি! নাই হ'ক উইল, ম'লে পরে টানাটানি করেও কিছু পেতে পার; কিন্তু সে এলে সব দিক্ ফরসা!

শ্যামাচরণ।—সেও কি হয়?

এই কথায় হলধরচন্দ্রের মুখটা যেন ম্লান হইল। হলধর আমতা-আমতা-স্বরে বলিল,—"হরে মুহুরী সেদিন একখানা লিখেছে যে! তাতেই যদি—"

সকলে বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে হোক। তুই যেন আর লিখে বসিস্-নে।"

"না—না—তা নয়—তা নয়—তবে—"

"তবে কি রে? লিখেছিস্ নাকি কিছু? কবে লিখ্‌লি? করেছিস্ কি রে?"

হলধরচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভ, লজ্জায় অনেকক্ষণ নিরুত্তর। অবশেষে, সকলের নিতান্ত পীড়াপীড়ির পর, সলজ্জভাবে উত্তর করিল,—"কি কর্‌বো দাদা-ম'শায়, বড় মাথার দিব্যি দিলে —বড় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাতে ধ'রে বল্‌লে—কিছুতেই তাই সে কথা ঠেল্‌তে পারলেম না। তাই আমি রামশরণ দাদাকে আস্‌তে চিঠি লিখেছি। তা' সে চিঠি পেয়ে তিনি যে আস্‌বেন, সে কথা মনেও কর্‌বেন না।"

"তবেই দেখ্‌ছি হয়েছে; তুই সব্ মাটী করেছিস্।"

সকলে একবাক্যে এই কথা বলিয়া, তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সহসা মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও বুঝি এতটা কষ্ট হইত না—সকলে এমনই মর্ম্মাহত হইলেন।

হলধরচন্দ্র আমতা-আমতা-স্বরে কহিল,—"সেজন্যে আপনাদের চিন্তা নেই—সে চিঠি পৌঁছাতে-পৌঁছাতেই বুড়ীর শেষ হবে। আপনারা এখনকার যা কর্ত্তব্য হয়, তা'ই করুন।"

কথাটা শিবরাম খুড়ার বড়ই মনোমত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমিও তো তাই বলি! নাড়ীর য়া' গতিক, তাতে এই জ্বরটার পরই যে কি হয়, তা' বলা যায় না। তা' তার জন্য আর এত চিন্তা কেন? রামশরণ এসে পৌঁছান

তো দূরের কথা, আমি নিশ্চিত বল্‌ছি, চিঠিও পৌছানর ভর সইবে না। সে বিষয়ে তোমরা সব নিশ্চিন্ত হও; আর এখনকার যা করবার, তারই চেষ্টা পাও। কি বল শ্যামাচরণ! তোমরা কি মত?"

"আজ্ঞে, যা' বল্‌ছেন।"

"তবে মুশোবিদেটা এখনই করে আনো ঝাঁ ক'রে। আমি যাই—আর একবার হাতটা দেখি-গে।"

এই বলিয়া, শিবরাম প্রস্থান করিলেন। শ্যামাচরণ, হরিদাস মুহুরীর নিকট একটা মুশাবিদা করিতে গেলেন। অপরাপর সকলে, আন্দাজ-মত, বুড়ীর কি কি স্ত্রীধন ও নগদ সম্পত্তি আছে, তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কোনরূপে বুড়ীর একটা ঢেরা-সইও যাহাতে লইতে পারা যায়, এমনই সব যোগাড়-যন্ত্র হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কিছুতেই স্বীকার পাওয়াতে পার্‌লেম না। চোরের অধিক মার, মেরেছি; আঙুলের নোখের, মাঝে শলা পুরে দিয়েছি; ছিঁচ্‌কে পুড়িয়ে লাল ডগ্‌ডগে করে, গায়ে ছাঁকা দিতে গিয়েছি; কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না।"

"কি বলে হতভাগী ?"

"বেদম মারেও কথাটি কয় না ; নিতান্ত যখন কষ্ট হয়, তখন হদ্দ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বলে–'উঃ—বড় যন্ত্রণা—আমি এখনও মলেম না ?' ছুঁড়িটার কাণ্ডকারখানা দেখে, আমি তো অবাক! লোভে ভুল্‌লো না, ভয়ে ভুল্‌লো না, গালিগালাজে ভয় নেই, যন্ত্রণায় ভয় নাই, মরণে ভয় নেই। এ বয়সে আমি অনেক দেখেছি, অনেককে ঠিক্ করেছি ; কিন্তু এমনটী কখনও দেখি-নি। আমি যে আমি–আমিও ওর কাছে হার মান্‌লেম !"

"তবে বোন, আর নয়—আজ আমার কারখানাটাই একবার দেখ। আমি শিকড় ধরে টান টান্‌বো—দেখি কোথায় যায় ? বেটি বদ্‌মায়েসের ঝাড় ; মার-ধ'রে ওর কি কিছু হয় ? যার জন্যে ওর এত ভিট্‌কেল্‌মি, আজ আমি ওর তাই খোয়াবো। আর তা' না হলেও, ও জব্দ হবে না কিছুতেই—তা গেলেই ওর দড় ভাঙ্‌বে জানিস্। ও যে সতীত্ব-সতীত্ব ক'রে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেছে, আমি ওর আজ তারই মাথা আগে খাবো ; তার পর অন্য কথা ? আমি আজ হৃদয় বাবুকে ঠিক করে রেখেছি—সে বেটাই ঠিক্ কাম ফতে করে দেবে! সে বলেছে, খাঁটি-মাটি একটু টেনে—এই এখনই আস্‌বে !"

"তা যেন বটে ! ওর কাছে পার্‌বে কি ?"

"পার্‌বে না-কি ? খুব্ পার্‌বে ! একলা যদি নাও পারে, দু'তিন্‌টে গুণ্ডা শুদ্ধ ঠিক আছে——"

"সে বরং হ'তে পারে। বেটীর গুমোরটা একবার ভাঙ্‌তে পার্‌লেই হয় বটে ! তা' বেস্—তা'ই—তোমারই উপর ভার।

দেখ বোন—যদি কিছু কর্‌তে পার। মার-টার খেয়ে, এই সময় কিন্তু খুব বেহুঁস্ হয়ে পড়ে আছে। ঘরের দরজাও খোলা আছে। এখনই যদি পার্‌তে—"

এমন সময়, টলিতে টলিতে, হৃদয় বাবু উপস্থিত। নেশায় যত না হউক, বাবু রঙেই চতুরং—আমোদেই টলটলায়মান।

"চুপ—চুপ—মাত্‌লামী করিস্‌নে চাঁদ!"

"দূর শালী, আমি কি মাতাল হ'য়েছি! কৈ, কোন্ ঘরে?"

রাত্রি গম্‌গম্ করিতেছে। চারিদিক 'নিস্থতি'।

"আস্তে—আস্তে!"

দূর হইতে দুই জনে ঘর দেখাইয়া দিল। আঁধারে আঁধারে একটী অপরিচিত পরপুরুষ আসিয়া, একটী অপরিচিতা কামিনীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোক দুইটী তফাতে সরিয়া গেল।

ঘরের ভিতর একটী মিটমিটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল কামোন্মত্ত যুবা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

"কে—কে তুমি?"

যুবতী চমকিয়া উঠিল,—"কে—কে তুমি?"

পরক্ষণেই উন্মত্তভাবে বলিতে লাগিল,—"একি—একি! কে—কে তুমি?"

যুবতী কাঁপিতে লাগিল।

"তুমি!—তুমি এখানে?"

যুবকও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি! —তুমি এখানে?"

যুবতী আরও কাঁপিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার স্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

যুবক আরও বিস্ময়-জড়িত-স্বরে উদ্বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"শ্যামা!—শ্যামা!—তুমি এখানে? তুমি এখানে কেমন করে এলে?"

শ্যামা, বিস্ময়ের সহিত, ভয়-বিহ্বল-চিত্তে বলিয়া উঠিল,—"একি দেখি! তুমি!—তুমি!—সত্যিই কি তুমি? তুমি কি এখনও বেঁচে আছ?—না, ভূত হয়েও আমার ধর্ম্ম রক্ষা করতে এসেছ।"

যুবক কম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"শ্যামা!—শ্যামা!—আমি ভূত নই!—দেখ, দেখ, আমি ভূত নই—আমি হৃদয়—তোমার স্বামী——"

"স্বামী—স্বামী?—আমার স্বামী?—আমার স্বামী তো জলে ডুবে——"

শ্যামার কথা শেষ হইল না। যুবক অগ্রসর হইয়া, শ্যামার হস্ত ধরিতে গিয়া, বলিলেন,—"শ্যামা! এই দেখ, আমি ভূত নই—আমি তোমার স্বামী! আমি পদ্মায় ডুবেছিলেম বটে, মরি-নি!"

শ্যামা শিহরিয়া সরিয়া গেল।

যুবক আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি পদ্মায় ডুবেছিলেম বটে, মরি-নি! পার হওয়ার সময়, বিকেল-বেলা, হঠাৎ একটা ঝড় উঠে নৌকোখানাকে ডুবিয়ে দেয়। আমাদের গাঁয়ের হরে কামার, ঢাকার কেঁদারে মুহুরী—তারাও সব সেই নৌকোতেই ছিল; নৌকো-ডুবির পর, কে কোথায় ভেসে যায়, কিছুই

আর জান্‌তে পারি-নে; তারাও দেখে যে, আমিও তলিয়ে গেলেম। আর সেই থেকেই দেশে রাষ্ট্র—আমি ডুবে মরেছি। কিন্তু হায়! এই সব দেখ্‌তে হ'বে ব'লেই বুঝি—”

বলিতে বলিতে, যুবকের চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। শ্যামা একদৃষ্টে যুবকের মুখপানে চাহিতে লাগিল।

যুবক, আপনা-আপনিই মনোগতি প্রতিরোধ করিয়া, আবারও বলিতে লাগিলেন,—“ডুবে ডুবেই অনেকটা দূর গিয়ে, শেষে আমি ভেসে উঠি—স্রোতে ও ঝড়ে আমায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রায় এক-কোশ দূরে একটা ঘাটে কতকগুলো নৌকো বাঁধা—আমি তারই একখানাতে গিয়ে আট্‌কে পড়ি। জ্ঞান আমার তখনও খুব ছিল; আমি চেঁচিয়ে উঠি। ঝড় একরকম তখন থেমে গিয়েছিলো; মানুষের সাড়া পেয়ে, মাঝিরা আমার তুলে ফেলে—গা-হাত-পা মুছিয়ে দেয়—কাপড় ছাড়ায়।”

যুবতী ছলছল-নেত্রে পাগলের মত চাহিয়া রহিলেন।

যুবক আরও বলিতে লাগিলেন,—“কল্‌কাতায় পালানর ঝোঁকটা তখনও কিন্তু আমার বেদম! আমি তা'দের কাছে তাই নাম-ভাঁড়াই, বাড়ীর ঠিকানায়ও ফরিদপুর-জেলার একটা গ্রামের নাম করি। তার পরই আর কি—পর দিন তাদের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে, সটান গোয়ালন্দ হ'য়ে, কল্‌কাতায় চলে আসি। কারুকে আর খোঁজ-খবরটি পর্য্যন্ত দিই-নে; আত্মীয়-লোকের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করি-নে; কোনখানে কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভব হ'লে, মুখ ঢাকা দিয়ে পেছিয়ে পড়ি। মা মরার পর আত্মীয়-স্বজনকে লুকিয়ে বাড়াঘরগুলো

বদ্‌খেয়ালিতে উড়িয়ে দেওয়ায়, মনেও কতকটা বিকার জন্মে-ছিল; তাই আর কারুর সঙ্গে দেখাই করবো না, স্থির করেছিলেম।

"কল্‌কাতায় এসে, তার পর যা' যা' কর্‌ছি, তা' তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ। কাজের মধ্যে একরকম মুটেগিরি বল্‌লেও হয়; আর তার উপার্জ্জন—দেখ্‌ছোই তো এই সন্ধ্যায়!"

যুবক বড়ই কষ্টের সহিত যেন এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামার চোখের ঘোর যেন কাটিয়া গেল। শ্যামা দেখিল—এবে সত্যই তার স্বামী হৃদয়! শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"স্বামী? তবে তুমি আমায় রক্ষা কর—আমার বাঁচাও—আমার মান যায়, ধর্ম্ম যায়, প্রাণ যায়—আমার বাঁচাও।"

যুবকও উন্মত্তের প্রায় আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"শ্যামা—শ্যামা! তোমায় এখানে কে আন্‌লে?"

শ্যামা উদ্বেগের সহিত বলিতে লাগিল,—"আমি নারকী—আমি মহাপাতকী, তাই এমন ঘটেছে আমার! আমি মাকে ফাকি দিয়ে—দাদাকে লুকিয়ে—বৌকে ভুলিয়ে নিয়ে, পুণ্যি কর্‌তে গিয়েছিলেম; তারই ফল এই হাতে-হাতে। আমার পাপের কি অন্ত আছে? যে সতী-লক্ষ্মী বৌ—আমার কথায় ওঠে-বসে, আমার কথায় মরে-বাঁচে, আমি তাকেই রাস্তায় মেরে ফেলে এয়েছি; সে সব পাপ আমার কোথায় যাবে আর?"

উন্মাদের মত শ্যামা আত্মগ্লানি করিতে লাগিল।

যুবক মিষ্টকথায় ততই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন,—"আর কেঁদো না—চেঁচিও না—তা হ'লে

কাজে বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে। চুপিচুপি কথা কও, আর গোলমালে কাজ নেই। তার পর যা', যা' কর্‌তে হবে, দেখি আমি বিবেচনা ক'রে।"

শ্যামা একে একে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। বাড়ী হইতে বাহির হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, এখনকার অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্তই সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শেষ বলিল,—"আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও।"

"তুমি চুপ কর—তোমার কোন চিন্তা নেই—আমি এখনই চল্‌লেম—দেখি, কোন উপায় হয় কি না!"

যুবক গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিলেন।

শ্যামা, তাঁহার পা-দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ফেলে যেও না! তুমি চলে গেলে, আমি যে আর এক দণ্ডও বাঁচতে পার্‌বো না।"

যুবক আশ্বাস দিলেন,—"ভয় নেই—আমি আসি। তুমি ভয় করো-না—আমার কথা শোন।"

যুবক বহির্গত হইলেন। অপর ঘরে স্ত্রীলোক দুইজন অপেক্ষা করিতেছিল। অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তারপর সেখান হইতেও চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কেহ বলিতে লাগিল,—"বেটাকে জালিয়াতে ফেলা যাক।"

কেহ বলিতে লাগিল,—"হাতে একটা ঘটিবাটী দিয়ে, চোর ব'লে পুলিশ-সোপর্দ্দ করে দেওয়া যাক।"

নবকুমার চন্দ্র, আজ পাঁচ মাস যাবৎ পেনু উকীলের মুহুরী-গিরি করিয়া, আপনাকে একজন বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এতক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ গম্ভীর-স্বরে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অনধিকার-প্রবেশ, পরস্ত্রীর প্রতি আক্রমণ—আইনের এমন্ একটা ধারাতেও ফেলা যায়।"

ইতিমধ্যে, সকলের উপর টেক্কা দিয়া, শ্রীমান্ পরাণকৃষ্ণ চাটুর্য্যে ভায়া বলিয়া উঠিলেন,—"খানসামা-গলি-থানার রাম কান্ত ইনিস্‌পেক্টার আমার সম্বন্ধীর বোনপো-জামাই। আমারও সঙ্গে তার খুব দহরম-মহরম!—এক গ্লাসের ইয়ার আর কি? কুছ্ পরওয়া নেই—তারই দ্বারা আমি এখনই বেটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি! বড় জোর—দু'এক গ্লাস টানানর ওয়াস্তা!"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই, সুরে সুর মিলাইয়া, জানি-না কি ভাবে, অবিনাশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—"নিদেনে, নতুন মেয়ে-মানুষটার

লোভেও তো আছে।"

অমনি, বাড়ীওয়ালীও বলিয়া উঠিল,—"তা' বাপু, তা'তেও আমি রাজি! টাকা আমার গিয়েছে, না যেতে আছে? ও বেটাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে আমি সব কর্‌তে রাজী আছি। বেটা মিছরির ছুরি হেনেছে বুকে?"

কথায় সায় দিয়া, অবিনাশচন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিক্ বলেছ মাসী? বেটা ঠিক্ মিছরির ছুরিই হেনেছে বুকে!"

কথাটা মনোমত হওয়ায়, বাড়ীওয়ালী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"তার কি আর কথা আছে? আর একটু হ'লে কি আর রক্ষে থাক্‌তো? ভাগ্যিস্ দুঃখীরাম জমাদারের সঙ্গে আমার সম্প্রীতটা ছিল—ভাগ্যিস্ সে এলে খাতির-যত্ন ক'রে পান-তামাকটা খেতে দিয়ে, আদর-অভ্যর্থনা করি। বল্ দেখি একবার—সে যদি এসে খবরটা না দিয়ে যেতো, তবে কি হ'তো এতক্ষণ? এ যোগাড়-যন্ত্রই বা কোথা থেকে হ'তো—আর কোথায়ই বা এতক্ষণ থাক্‌তেম আমরা? বিশেষ,যদি রাত্রিকালও না হ'তো, তবে তোদেরই বা কোথায় দেখা পেতেম? এই যে ছুঁড়িটাকে সরিয়ে রেখে এলেম ঝাঁ ক'রে, তাই বা তা'হলে হ'তো কোথা থেকে? কর্‌লে কিছু দিতো, না মা-বাপ কিছু বল্‌তে দিতো? বেটা এমন কাণ্ডটাই বাধিয়েছিলো এখনই; বেটাকে ছাই পেড়ে কাট্‌লেও এ রাগ যায় না?"

"ঠিক তো—ঠিক্ তো!"

আর আর যাঁহারা বাড়ীওয়ালীর সহায়তা করিবার জন্য সাজিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞা—বেটা যাতে জব্দ হয়। বেশীর ভাগ কেহ কেহ আবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ রকম সব ছোট্ট-লোকদের জ্বালাতেই,

এসব যায়গায়, ভদ্রলোকদেরও মান-সম্ভ্রম ক্রমে নষ্ট হ'তে চললো। দুই-এক বেটা বদমায়েস্ জুটে, আমাদেরও মুখে চুণকালী দিলো। এসব যায়গায় আগে আমাদের কি সম্ভ্রমই না ছিল; কিন্তু বেটাদের জ্বালায় সব গেল? দুষ্টু গরুর সঙ্গে কপিলে-গাইও বাঁধা পড়ে; আমাদেরও ক্রমে দেখ্ছি, তা'ই হ'তে হ'লো। হায়! এসব কি কম দুঃখের কথা!"

সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ অমনি সুর ধরিলেন,—"এর বিহিত সুতরাং আমাদেরই করা উচিত। বেটা যা'তে জব্দ হয়, তা' না করতে পার্লে, আমাদের আর মুখ-দেখান ভার হ'বে।"

"ঠিকই বটে—ঠিকই বটে! এর বিহিত আমাদেরই করা উচিত।"

সকলের মুখ হইতেই একবাক্যে ঐ রায় প্রকাশিত হইল। স্থির হইল, বাড়ীওয়ালীর গায়ে আঁচটী পর্য্যন্ত লাগিবে না, অথচ তাঁহারাই কার্য্য সমাধা করিয়া দিবেন। আর, তাহা না করিয়াই বা তাঁহাদের উপায় কি? বাড়ীওয়ালীর যাহারা বন্ধু-বান্ধব বা বনেয়া মেয়ে-মানুষ—কর্ত্তারা তো তাদেরই পোষা 'ময়না!' তার আর বুলি না সরিবে কেন? এ রকম দু'দশটা কথা না রাখিলে, তাঁদের আর ঠাঁই কোথায়? বিশেষ, নিরীহ 'বাড়ীওয়ালী মাসীর' প্রতি অকারণ একজনের এতটা জুলুম—এটা সকলেরই অন্তরে অন্তরে বিঁধিয়াছে যে! সুতরাং একবাক্যে সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন। রামকান্ত ইন্‌স্পেক্টারের সহিত যোগা-যোগেই কাজ হইবে—চাই তাতে দু'শো লাগুকই, আর দশ-বিশ বাঁচুকই—সকলেরই সেই মত

ঘরের পয়সা খরচা করিয়াও একবার শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন—এমনই সকলের প্রতিজ্ঞা হইল।

পরাণকৃষ্ণের পরামর্শই তখন স্থির হইয়া গেল। খানসামা গলির থানাতে গিয়া, রামকান্ত ইনিস্‌পেক্টারের সহিত বন্দোবস্ত করাই ঠিক।

রাত্রি দু'পুর হইতে ঘুরিতেছেন। কাজ কিন্তু কিছুই হইল না। থানার গেটে যার পাহারা, সে তো একবার আদ্যোপান্ত সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনিয়া লইল। পরে, তার জুড়িদার দুই জন—তাহারাও একে একে, আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত কথা পর-পর শুনিয়া লইল। হেডকনেষ্টবোল আসিলেন; তিনিও ঐরূপ শুনিলেন। ক্রমে পাহারাওয়ালা-জমাদারদিগের যত বদলী যাইতে-আসিতে লাগিল, তাহারাও, তারই মধ্যে একটু একটু অবসর করিয়া লইয়া, ব্যাপারখানা সব শুনিয়া লইল।

মধ্যে একবার রাইটার-কনেষ্টবোলের সাক্ষাৎ পাইলেন। কিন্তু ব্যাপারটা পরপর সব শুনিয়া, অনেক ইতস্ততের পর, তিনি বলিলেন,—"অত কথা সব ডায়েরি-জাত করতে তো পারি-নে! হদ্দ এই লিখে নিতে পারি—তোমার অমুক মানুষ কাল বিকেল থেকে নিরুদ্দেশ। তার চেয়ে বেশী লিখ্‌তে আইনে আটকায়। ২৪ ঘণ্টার আগেকার কথা লেখাতে গেলেও দোষ; লিখ্‌লে তো বে-আইনে কাজই করা হয়। তবে তুমি অত ক'রে ধরেছো, তারই খাতিরে আমি না হয় এই পর্য্যন্ত লিখে নিতে পারি—'কাল বিকেল থেকে তোমার

'মানুষ নিরুদ্দেশ।' বাস্—রাজী হও তো, সই কর—চলে যাও।"

"সে কি? সে কি বলেন? তা'হলে আমার আর কি হ'লো? আমি যে তা'কে—"

"থাম—থাম! আর আমার কাজ নয়—থাম! ইনিস্‌পেক্টারকে বল-গে যাও।"

"তিনি কোথায়? কেমন ক'রে তাঁর দেখা পাবো? আপনি তাঁর সঙ্গে যদি—"

"ভালা আপোদ দেখ্‌ছি! ঐখানে চুপ ক'রে ব'সে থাক; দেখা হ'বে এখনই।"

বড়ই রুক্ষস্বরে ঐ কথা-কয়েকটী বলিয়া, রাইটার-কনেষ্টবোল মহাশয়, খাটিয়ায় গিয়া আড়া-মোড়া ভাঙ্গিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হয়-হয়। কিন্তু কার্য্য কিছুই হইল না। ইনিস্‌পেক্টারের সঙ্গেও এ পর্য্যন্ত দেখা হইল না; কেহ কোন কথার উত্তরও এপর্য্যন্ত সঠিক দিল না! বেশীর ভাগ, এক আদবার এক আদজন কনেষ্টবোল আবার, আধা-হিন্দি আধা-বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল,—"টাকাকড়ি কিছু আছে বল্‌তে পারিস্! থাকে তো, একবার ইনিস্‌পেক্টারকে জাগিয়ে, দেখি চেষ্টা ক'রে।" কিন্তু, পরক্ষণেই, তাঁহার হাতে পয়সা-কড়ি কিছুই নাই—তিনি নিদারুণ বিপদগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, দাঁতমুখ বিকট-শিকট করিয়া, চলিয়া যায়। কেহ কেহ আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে—অবশ্য নির্ভাজ সত্য কথাতেই—মনের আসল ভাবটাও প্রকাশ করিয়া বলে,—

"শালার পয়সা নেই, কড়ি নেই,—শালা মাগ খালাস্ করতে এসেছে রে! যা' শালা যা'—মাগ বিক্রী কর্‌গে আগে, তার পর সেই টাকা নিয়ে থানা-পুলিশ করতে আসিস্! থানাপুলিশ কি আর অম্‌নি হয়? পুলিশ, বেটার মাইনে-খেগো চাকর আর কি?"

এমনই কারখানাটা এতক্ষণ চলিতেছিল! এদিকে রাত্রিটাও প্রভাত হইয়া গেল। কথাটাও সেখানে যা' রাষ্ট্র হইবার, হইয়া গেল; যোগাড়-যন্ত্রও যাঁহাদের যা', সব ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু, যিনি সমস্ত রাত্রি থানার দরজায় বসিয়া আছেন—থানার টিক্‌টিকি হইতে সকলকে বিনয় করিয়া আপনার দুঃখ-কাহিনী বলিতেছেন, তাঁহার কোনই ফল ফলিল না। মধ্যে একবার চকিতের ন্যায়, থানার ইনিস্‌পেক্টার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; কথাগুলোও তিনি সব শুনিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু উত্তর দিয়াছিলেন,—"যাও—যাও, ও সব কথা জমাদারকে জানাও-গে যাও।" কিন্তু, জমাদারকে সে কথা জানাইতে গেলে, তিনি ফিরাইয়া-ঘুরাইয়া টাকার কথাই বারম্বার জিজ্ঞাসা করেন ও আবার ইনিস্‌পেক্টারের সহিত দেখা করিতে বলেন। আর, সেই দেখা করার আশাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

বেলাও ক্রমে আটটা। এর মধ্যে, তিনি আর সূত্রই পাইলেন না। তাঁহার অভিযোগে কেহ কর্ণপাতই করিল না। অথচ, এ আবার কি?—তাঁহাকে আর ফিরিয়া যাইতেও দেয় না কেন? যাইবার চেষ্টা পাইলে, প্রথমতঃ কনেষ্টবোলেরা বলিয়াছিল,—"এখনই সব ঠিক হ'বে; ফিরে যেতে হ'বে না।" এখন

আবার অন্যভাবের কথাবার্ত্তা সুরু করিল। হঠাৎ দারোগা মহাশয় হুকুম দিলেন,—"বাঁধ শালাকে—লাগাও হাতকড়ি। বেটা জালিয়াৎ—বেটা জুয়োচোর—বেটা বদ্‌মায়েস্!"

সঙ্গে সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবোল অমনি, হাতে হাতকড়ি দিবার যোগাড়-যন্ত্র করিতে লাগিল।

চক্ষুস্থির আর কি?

"ওকি বলেন আপনারা? রাত্তির দু'পুর থেকে ঘুরছি আমি—আমার এমন বিপদ, এসময় কি বিদ্রূপ ভাল লাগে? আমায় কি পাগল—"

"চোপরাও শালা!—জোচ্চোর, জালিয়াৎ, বদ্‌মায়েস্!"

সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন জনে হাত-কড়ি লইয়া বাঁধিতে গেল।

"এ কি? এ কি করেন? আমার যে বড় বিপদ! আমার স্ত্রী যে বেশ্যালয়ে বিক্রীত—আমি যে তাকে বাঁচাবার জন্যে এসেছি! আমার ধর্ম্ম যায়—মান যায়—প্রাণ যায়; আপনারা এসময় এমন করবেন না—আমার বাঁচান, আমায় রক্ষা করুন—"

"চোপরাও শালা—ফের বদ্‌মায়েসী? শালাকো আবি ঠাণ্ডা-গারদমে লে যাও তো রামসিং!"

"আপনারা মা-বাপ; আপনারা মারলেও মারতে পারেন, রাখলেও রাখতে পারেন! আমার যা' বলতে হয়, যা করতে হয়, পরে বলবেন, পরে করবেন! এখন কিন্তু আমায় বাঁচান—আমার প্রাণ যায়, ধর্ম্ম যায়—আমার বাঁচান।"

যতই অনুনয়-বিনয় করিয়া বলেন, "আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচান"; দারোগা মহাশয়ের ততই ঐ কড়া হুকুম!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে হুকুম, কার্য্যেও বাহাল হইতে লাগিল।

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! আমায় কি দোষে তোমরা এমন কর্‌ছ? আমি তো এর কিছুই জানিনে? আমায় ছেড়ে দেও—আমি যাই—আমরা ধর্ম্ম গেল, সব গেল—আমায় ছেড়ে দেও—আমায় আর আট্‌কে রেখো না! ও গো! আমার স্ত্রী যে এখনও বেশ্যালয়ে; তোমরা তারে বাঁচাবে ব'লে এসেছিলেম যে! তোমরা ও কি কর? ওগো! তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমরা আর দেরী ক'রো না, আর দেরী ক'রো না। হায়! এতক্ষণ তার যে কি সর্ব্বনাশ হ'লো, সে বোধ হয় এতক্ষণ প্রাণে মারা পড়্‌লো; ওগো! তোমরা একবার চল—একবার চল—আগে তাকে বাঁচাবে চল! জাত যায়—ধর্ম্ম যায়—তাকে বাঁচাবে চল।"

কিন্তু সে কথা কে শোনে? হাতে হাতকড়ি পরাইতে পরাইতে, তিন-চারি জনে ধরিয়া, তাঁহাকে একটা ঘরের মধ্যে পুরিয়া চাবি-বন্ধ করিতে গেল। তিনি ততই চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপরাধে, কেন তাঁহাকে এরূপে আবদ্ধ করা হইতেছে, সে কথাও কেহ আর বলিল না; তাঁহার কোন কথাও কেহ আর শুনিল না। তিনি কেবল হায় হায় করিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি কি নরাধম? আমি জীবিত থাক্‌তে আমার স্ত্রীর এই দশা আমায় দেখ্‌তে হ'লো? আমি বেঁচে থেকেও তার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না? এর চেয়ে, কেন আমার মরণ হ'লো না। মরণই যে আমার এর চেয়ে ছিল ভাল!"

এমনই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা উপভোগ করিতে করিতে, হতভাগ্য হৃদয় আবদ্ধ হইলেন। তখন আর তাঁহার কোনই খোঁজখবর পাওয়া গেল না। এদিকে, বেশ্যালয়ে শ্যামারই যে আর কি দশা হইল, তিনিও তাহা জানিতে পারিলেন না। ঘটনা-চক্র এমন ঘটনাই ঘটাইল।



দশম পরিচ্ছেদ

রামশরণ বাবু আজ দুই দিন যাবৎ গোয়ালন্দে অপেক্ষা করিতেছেন। কুলির চালান এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই; দুরং হইতে সাহেবের প্রেরিত কর্ম্মচারীও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি, সাহেবকে টেলিগ্রাম করিয়া, প্রতি-উত্তরে কুলিদের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবারই আদেশ পাইয়াছেন।

ভোরের ট্রেণেই কুলিরা আসিয়া পৌঁছিল। কাজের মহা ভিড় পড়িয়া গেল। ষ্টীমার প্রস্তুত; ৯টার সময়ই ছাড়িবে। রামশরণ বাবু তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে জাহাজে উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একটী একটী করিয়া কুলি তাঁহার নিকট আনীত হইতে লাগিল; এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার, তিনি লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

এই সময়ই কলিকাতা হইতে এক জরুরি টেলিগ্রাম! রামশরণ বাবু দেখিলেন, হৃদয় তাঁহাকে ঐ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে। কিন্তু, কে সে হৃদয়? ভগ্নীপতি?—সে তো অনেক দিন হ'লো, পদ্মায় ডুবে মারা গিয়েছে! রামশরণ বাবু বিষম সমস্যায় পড়িলেন। যাহা হউক, মহা-সংশয়-চিত্তে টেলিগ্রামখানি পড়িতে লাগিলেন।

তাহার মর্ম্ম এই,—

"আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবেন। আপনার ভগিনী শ্যামা বেশ্যার নিকট বিক্রীত হইয়াছিল। কল্য সন্ধ্যার সময় আমি তাহা জানিতে পারিয়া, পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু বেশ্যারা বড়ই চক্রান্ত করিয়াছে; তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া, আমিও বিপদে পড়িয়াছি। আপনি শীঘ্র আসিবেন। নহিলে, আর উপায় দেখি না। অনেক যোগাড়-যন্ত্রে এই টেলিগ্রাম করিলাম।"

"একি! হৃদয়? শ্যামা? হৃদয় জীবিত? শ্যামা বেশ্যালয়ে বিক্রীত? এ কি?"

রামশরণ বাবু যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। হাতের কলম হাতেই রহিল। কলম আর যেন সরিতেছে না!

বেলাও এদিকে হইয়াছিল; সুতরাং মেলের চিঠিপত্রও আসিয়া পড়িল। ডাক-পিয়ন আসিয়া, নিজ-নামের ও আফিস-সংক্রান্ত খানকয়েক চিঠি তাঁহার হাতে দিয়া গেল।

একখানি চিঠি—তাহারই মধ্যের দুই-দশটী ডাকঘরের পদ-চিহ্নাঙ্কিত একখানি চিঠিই—তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ

করিল। তিনি দেখিলেন—চিঠিখানি বাড়ীর চিঠি—কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং সেখান হইতে প্রতিপ্রেরিত হইয়া গোয়ালন্দে আসিয়াছে। সুতরাং আগেই সেই চিঠিখানি খুলিলেন।

কিন্তু, কি দুর্দ্দৈব ? পত্রে লিখিত,—

"শ্রীচরণেষু,

দাদা মহাশয়, আপনার মাতা-ঠাকুরাণী সাংঘাতিক পীড়িতা। আপনি পত্রপাঠ বাড়ী আসিবেন। বিলম্ব করিবেন না। বিলম্ব করিলে, সাক্ষাৎ না হইতে পারে। বাড়ীতে আর কেহই না থাকায়, তাঁহার আরও কষ্ট—কেবল আপনাকে একবার দেখিবার অপেক্ষাতেই তিনি যেন বাঁচিয়া আছেন। অধিক আর কি লিখিব ?

নিবেদক শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী।"

চক্ষুস্থির! এ পত্র পড়িয়া তো একেবারেই চক্ষুস্থির!

"আজ এসব আবার কি দেখিতেছি ? হৃদয় বাঁচিয়া—শ্যামা বেশ্যালয়ে—মা মৃত্যু-শয্যায়—এসব এ কি দেখি ?"

কিন্তু এদিকে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সরকার-গোমস্তারা বলিয়া উঠিল,—"বাবু! ষ্টীমারের প্রথম 'সিটি' দিল। আর জন-কয়েক মাত্র বাকী ; আপনি আর দেরি করিবেন না। ষ্টীমার শীঘ্রই ছাড়িবে।"

সহস্র ভাবনা দূরে ফেলিয়া, রামশরণ বাবু আবারও খাতা-পত্র লইয়া বসিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন,—"লোকগুলো ষ্টীমারে বোঝাই দিয়েই, যা-হয় একটা স্থির কর্‌ছি এখনই।" সুতরাং এক-একটি করিয়া কুলি আবার আসিতে-যাইতে লাগিল।

আর একটী কুলি চালান হইলেই কাজ শেষ হয়। এইবার সেই কুলিটি আনীত হইল।

এটী স্ত্রীলোক কুলি, কিন্তু কেন অবগুণ্ঠনবতী? স্ব-ইচ্ছায় চাকরী করিতে যাইতেছে, কিন্তু কেন কাঁদিতেছে? বাবুরও নজর সেইদিকে পড়িল।

তিনি চমকিয়া উঠিলেন—তাঁর শরীর কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—মনে হইল, ব্রহ্মাণ্ড যেন শূন্যে ঘুরিতেছে। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি বাস্তবিক স্বপ্ন দেখিতেছেন।

কিন্তু স্বপ্ন কতক্ষণ থাকে? রমণী চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—

"তুমি—তুমি—তুমি আমায়——"

রমণীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

রামশরণ বাবুও অনেকক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনিও যে কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে দ্বিতীয়বার জাহাজের সিটি-ধ্বনি! সকলে আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

রামশরণ বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন কি করি? কোন্ পথে যাই? ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে যাইব, না মাকে দেখিতে যাইব, না স্ত্রীকে বাঁচাইব? তা' ছাড়া আছে—সাহেবের কাজ! এখন কি করি? কলিকাতার যে টেলিগ্রাম,

তাহাতে কলিকাতায় না যাইলেই নয়; হলধরচন্দ্রের যে পত্র, তাহাতে ঢাকার দিকে এখনই রওনা না হ'লে, মার সঙ্গে আর জন্মের মত দেখা হবে না; আবার স্ত্রীকে বাঁচাইতে গেলে, ত্বরং গিয়া বড়-সাহেবের মত লওয়া চাই। তবে এখন, কোথায় যাই—কি করি?"

ইতিমধ্যে জাহাজের শেষ সিটি বাজিল—ভোঁ-ও ও।

সঙ্গে সঙ্গে রামশরণ বাবুর প্রাণেও যেন শব্দ হইল—ভোঁ-ও-ও!

তিনি দেখিলেন—চারিদিকেই সঙ্কট—চারিদিকেই ঘোরতর সমস্যা।

সম্পূর্ণ।

